স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৭ আজ রবিবার, এপ্রিল ১৭, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৭ম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৪৮-

এ মাসের সাহিত্য আসরের আহ্বায়ক ড: ফয়সল খান। এষ্টোরিয়ায় ফয়সলের বাসায়। আনিস চার্চ এভিনিউর এশিয়ান স্পাইসের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বাহার তাকে পিক আপ করবে। এমন সময় একটা ভ্যান এসে থামল তার সামনে। তখন বেলা এগারটা। এখনও এখানে বাঙালীর মেলা বসেনি। এখন একদম ফাঁকা।

ভ্যানের গায়ে লেখা 'করিম কনষ্ট্রাকশন কোং'। করিম নামটা দেখেই করিম চাচার কথা মনে পড়ল। চাচার সাথে যোগাযোগ নেই অনেক দিন। আজ ঘরে ফিরেই একটা কল করবে।

আশ্চর্য! ঠিক তখনি করিম চাচা বেরিয়ে এল ভ্যান থেকে। নিজেই ড্রাইভ করেছে। কেমন আছেন করিম চাচা? অনেক দিন আপনাদের সাথে যোগাযোগ নেই। কাজকর্ম কেমন চলছে?

ভালই চলছে। আমি তো তোমার চাচার সাথে আর কাজ করিনা। তোমার চাচাও নরম হয়ে গেছে। আর পরিশ্রম করতে পারেনা। তাই কাজ তেমন একটা নেয়না। ওনার সাথে পরামর্শ করে আমি নিজেই একটা কোম্পানী করেছি। আমার সাথে আলম আর কারী সাব আছে। আমরা তিনজনে ভালই করছি। এই ভ্যানটা কিনেছি। গাড়ীর চেয়ে ভ্যানের দাম অনেক কম। মাত্র এক হাজার ডলার। ভালই চলে।

আর একজন বাঙালী ভ্যান থেকে নেমে করিম চাচার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স পঞ্চাশোর্ধ, ছিপছিপে গড়ন। সাদা চুল দাঁড়ি।

করিম আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, এই হল আমাদের সারেং ভাইর ভাতিজা আনিস। ইনি কারী সাব। কয়েক বছর আগে তোমার চাচার সাথে কাজ করতেন। তারপর নিউজার্সি চলে যান ছেলের জন্য। ওখানে কাজ করতেন একটা পেট্রোল পাম্পে। ছেলে স্কুলে যেত। এখন আমার সাথে কাজ করে। কারী সাবের একটা কাহিনী আছে। তিনি এখন বিপদে পড়ে কাজ শুরু করেছেন। হালকা কোন কাজও পাচ্ছেনা। কাজ না করলেও চলবেনা। মানুষের ভাগ্য এমনই হয়। কোথায় তিনি এখন আরাম করবেন তা না করে এখন কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছেন। উপযুক্ত ছেলে থাকতে এমন কষ্ট। সবই কপালের লেখন!

ছেলের কি হয়েছে? আনিস জিজ্ঞেস করল।

এদেশে যা হবার তাই হয়েছে। বিদেশী বউএর কেরামতি চলছে। উনাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে।

উনার আর কেউ নেই?

না, স্ত্রী মারা গেছে বহু আগে। ছেলেকে নিজে বড় করেছে। তাকে সাথে নিয়েই এদেশে এসেছিলেন আজ বার বছর আগে। ছেলে এখানে লেখাপড়া করে ভাল চাকরি পেয়েছে একটা চেইন ষ্টোরে ম্যানেজার। কিন্তু কাগজ নেই। ছেলের চেহারা দেখতে খুব সুন্দর। একটা স্প্যানিশ মেয়ের সাথে ভাব হয়। মেয়ে দেখল ছেলের অনেক আয় আছে। এক সময় তারা বিয়ে করে। বিয়ে করার প্রধান উদ্দেশ্য হল কাগজ। বিয়ে করার পরই কাগজ হল ছেলের। কারি সাব যা রোজগার করতেন তা রাখতেন ছেলের একাউন্টে। একমাত্র ছেলেই তার সব। তিনি আর কিছু ভাবতে পারতেন না। বিয়ের পর ছেলে মেয়ে আলাদা থাকে। তিনি দেখলেন ছেলে দূরে চলে যাচ্ছে। তাই বুদ্ধি দিলেন বাড়ী কেনার। কারী সাবের যা টাকা আছে তা এবং ছেলের কিছু টাকা দিয়ে একটা বাড়ী কিনল। বাড়ী কিনে বেশ আরামেই ছিল সবাই।

কিন্তু ছেলের বউ একটা অঙ্ক করতে লাগল। দেখল এই বৃদ্ধ লোকটা ঘরের একটা জঞ্জাল। একটা ফ্লোর দখল করে আছে। যখন তখন যা ইচ্ছা তাই করতে চায়। রাতে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় যখন কারী সাব নামাজ পড়তে উঠেন। খাওয়া দাওয়াও তিনি নিজের মত করে খেতে চান। এটা একটা বাড়তি ঝামেলা। মাঝে মাঝে কি সব রান্না করে যার গন্ধে তার বমি আসে। অনেকবার কারী সাবকে বারণ করেছে এসব মসলা ব্যবহার না করার জন্য। কিন্তু কারী সাব এসব খাবার না হলে তার চলেনা। ওদের রান্না তিনি খেতে পারেন না। বউ দেখল তাকে বের করে দিলে নীচের তলাটা ভাড়া দেয়া যায়। এসব অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া যায়। একদিন বলেই দিল, ইউ মুভ আউট সামহোয়ার এল্‌স। আপনি অন্য কোন খানে চলে যান।

কারী সাব থ হয়ে গেল। ছেলেকে বলল। ছেলে বউকে জিজ্ঞেস করল। বউ বলল, ইয়েস, আই ডন্ট ওয়ান্ট টু সি দি আগলী ফেইস! হি ইজ এ বারডেন টু আস। এই কুৎসিত চেহারাটা আমি দেখতে চাইনা। সে একটা ঝামেলা।

ছেলে এবং বউর কথা বাড়তে লাগল। এক সময় বউ তালাকের ভয় দেখাল। সর্বনাশ! ছেলে দেখল তালাক দিলে সর্বনাশ। এই বাড়ীর অর্ধেক মালিক এখন তার স্ত্রী। বাড়ী কিভাবে কেনা হয়েছে, কার কত টাকা লাগানো হয়েছে এই বাড়ীতে সেটা কোন কথা নয়। আদালত দেখবে বাড়ী কার নামে। ছেলের নামে বাড়ী। অতএব বউ তার অর্ধেক মালিক। আর যায় কোথায়! কারী সাব নিজেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। এখন আমার সাথেই আছে। সবই কপালের লেখন!

কিছুক্ষন পরই বাহার এল। গাড়ীর পেছনে লতা আর বিন্দু। সামনে ড্রাইভারের পাশের সিট খালি। আনিস সেখানে বসল। গাড়ী চলছে। আনিস কারী সাবের কাহিনীটা বলল। বাহার আর বিন্দু মন্তব্য করল কয়েকবার। কিন্তু লতা একদম চুপ করে রইল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আসর শুরু হল। একে একে অনেকেই কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ পাঠ করলেন। লতা পাঠ করল স্বরচিত কবিতা। তার প্রথম কবিতা। সাহস করে পাঠ করেছে। সকলেই খুশিতে হাত তালি দিল। আনিস পাঠ করল সুকান্তের কবিতা। সবশেষে আজকের আসরে গল্প পড়বেন বাহার। গল্প পড়ার আগে ভুমিকা দিলেন, এই গল্প আমার শালিকাকে নিয়ে। এখানেই আমাদের আসে পাশেই থাকে। শুধু নাম বদল করে ঘটনা অপরিবর্তিত রেখেছি। গল্পের নাম 'পরচর্চা'। পাঠ শেষে এই গল্পের উপর আলোচনা, সমালোচনা শিরোধার্য। আমি গল্প শুরু করছি:

কসবা রেল স্টেশনে নেমে যদি পায়ে হেটে যেতে না চান তাহলে রিক্সা নিতে পারেন। তিন মাইল যাবার পর রিক্সা আর যাবেনা। এবার পদব্রজে।

গ্রামের আকাবাঁকা মেঠোপথ ধরে দু'মাইল, ক্ষেতের আল ধরে এক মাইল, তারপর নদী। না, নদীর উপর এখনও পুল তৈরী হয়নি। গ্রামের লোকেরা বাঁশের সাকো দিয়েছে, তাই সম্বল। তাও আবার বর্ষায় থাকেনা। কারণ নদীর পরিধি হয়ে যায় প্রায় এক মাইল। তখন ডিঙ্গি নৌকা একমাত্র উপায়।

সাঁকোর উপর দিয়ে খুব সাবধানে পেরোতে হবে। শহুরে আনাড়ী হলে পিছলে পড়ে যাবার সাম্ভাবনা। পড়তে গিয়েও সাবধানে পড়তে হবে। পিছলে পড়ে যাবার সময় যদি বাঁশের দুদিকে দু'পা চলে যায়, তাহলে নিম্নাঙ্গে যে ব্যথা পাওয়া যাবে তা জীবনভর মনে থাকবে। আর যদি দু'পা নিয়ে একদিকে পড়ে তাহলে বড়জোর একটা চুবানী খাবে, এই যা। কারন "বৈশাখ মাসে তার হাটু জল থাকে।

সাঁকো পেরিয়েই রাঙ্গামাটির পথ। আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়ে, লজ্জাবতী গাছের পাতা মাড়িয়ে, ঝোঁপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, এঁকে বেঁকে চলে গেছে একবারে ধলাই বিলের পাড়ে। ওখানেই পথের শেষ। সেই পথের পাশে, গাছগাছালিতে ঢাকা আমার কুড়েঘর। দিনে শেয়াল ডাকে - রাতে হুতুম পেচাঁ।

এ পর্যন্ত বলার পরই অনেকে আমাকে থামিয়ে দেন। থাক, আর বলতে হবেনা। বুঝা গেছে একবারে ক্ষেত। তারপরও যদি বলি যে, আমার আত্নীয়স্বজন কৃষিকাজ করে তাহলে তো কোন কথাই নেই। আমি যেন এই সমাজেরই যোগ্য নই। আমি বুঝতে পারি না আমার ভুলটা কোথায়। তাহলে কি বলব - আমার ধানমন্ডি আর গুলশানে দু'টা বাড়ী আছে, একটা চাইনীজ রেষ্টুরেন্ট আছে, দু'টা গাড়ী ও কয়েকটা ব্যবসা আছে? আর সকলেই যদি এ কথা বলি তাহলে ধানমন্ডি গুলশানে কত বাড়ী থাকতে হবে অথবা কয় তলা করতে হবে? আর এতগুলো চাইনীজ রেষ্টুরেন্টই বা কোথায় পাওয়া যাবে? তারপরও অনেকেই বলে যায়।

এইতো সেদিন এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তার একটা নয়, দু'টা চাইনীজ রেষ্টুরেন্ট আছে ঢাকায়। গাড়ী বাড়ী সব আছে। পরিবার সহ এসেছেন নিউইয়র্কে। একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন, কিন্তু মিলছেনা। অথচ তার হোটেলে কত লোক কাজ করে! যদি জিজ্ঞেস করি যে, তাদের এত সম্পদ কার হাতে দিয়ে কেন বিদেশে পড়ে আছে

তাহলে আরও অনেক শুনতে হবে। ক্ষ্যাত হবার ভয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।

মায়ের কাছে যারা মামাবাড়ীর গল্প করে তাতে কারও কোন ক্ষতি হয়না। শুধু প্রতিবাদ না করে ধৈর্য ধরে শুনা। প্রতিবাদ করতে গেলেই গল্পের রস তেতো হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশ থেকে দেশে গিয়ে যারা কল্পকাহিনী তৈরী করে বড় বড় কাজ সমাধা করে তারা সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি .. নাহ! পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে ভুমিকা এখানেই শেষ করে আসল গল্পে ফিরে আসি।

হঠাৎ একদিন কাকাশ্বশুরের চিঠি পেলাম । তিনি লিখেছেন, এমন সুপাত্র হাত ছাড়ার ভয়ে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি । কাউকে জানানো সম্ভব হয়নি। ছেলে কম্পিউটার সায়েন্সে এম, এস করার পর এখন একটা মালটি ন্যাশনেল কোম্পানীর ম্যানেজার। বেতন সপ্তাহে এক হাজার ডলার। এক মাস হল ছবিকে নিয়ে গেছে। ঠিকানা এই ইত্যাদি।

আজ থেকে সতের বছর আগে দেখেছিলাম তিন মাসের। ছবি কবে বড় হয়ে যৌবনে পদার্পন করে রূপের আলো ছড়িয়ে, পরিবারের মাথার মণি হয়ে একদিন মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াল তা আমার জানা নেই। চিঠি পড়ে খুশীতে নাচতে লাগলাম। একটাও শালীকা ধারে কাছে নেই। এবার পেয়ে গেছি। সাথে এম, এস করা ভায়রা ভাই। আমার আর তর সইল না। বিন্দুকে বললাম, ছবির রূপের এত প্রশংসা করেছ, আমার তো আর তর সইছেনা। রাত যতই হোক আজই দেখতে যাব।

রাত দশটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম ছবির বাসায়। খাওয়াদাওয়া, হৈ চৈ অনেক হল। শুরু থেকেই খেয়াল করলাম ভায়রা ভাই খুব কম কথা বলছেন। আমি এত হৈ চৈ করছি, আর তিনি হাতে গোনা কয়েকটা কথা বলেছেন। মনে করলাম তিনি হয়ত স্বল্পভাষী। যখন লেখাপড়া, চাকুরীর কথা উঠল তখন তার বাংলা বুঝতে আমার হোচট খেতে হল। তিনি 'শুদ্ধ ভাষায়' কথা বলছেন। খুব সাবধানে বলতে গিয়েও বলে ফেললেন, ফারকিং পাইচিলেননি? তখনও আমার হতাশ হবার কিছু ছিলনা। আমি যে ক্ষ্যাত, তেমনি করেই কথা বলি। ভাবলাম হয়ত তিনিও ঘরোয়াভাবে কথা বলছেন বলে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করছেন। যখন অফিসের কথা উঠল, কাজের কথা জিজ্ঞেস করলাম তখন আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কম্পিউটার নামে কোন বস্তুর সাথে তার পরিচয় নেই। কাজ করেন একটা 'ফার্স্ট ফুডের' দোকানে। যেটার নাম 'মাল্টি ন্যাশন্যাল কোম্পানী'।

দুজনে ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরলাম। একজন আর একজনকে প্রশ্ন করি, আমরাই উত্তর দেই। বিন্দু বলল, কাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাইরেক্টর হলে কি হবে, একবারে সোজা সরল মানুষ। কোথায়ও একটা কিছু আছে, যা দিয়ে এতবড় একটা ধোকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। আমি বললাম, এখন তো জিজ্ঞাসাও করা যাবেনা কি করে বিয়েটা হল। জিজ্ঞেস করতে গেলেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন হবে, আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে। আর আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে চাচা হার্ট ফেল করবেন।

বিন্দু বলল, পাঁচ ভাইয়ের পর একমাত্র বোন ছবি। চাচা ছবিকে যে কত স্নেহ আদর করেন তা প্রকাশ করা যাবেনা। কত ভাল ভাল বিয়ে কাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন এ খবর শুনলে কাকা টিকবেন না। যা হবার হয়েছে। এখন চেপে যাওয়াই ভাল।

আমরা চেপেই রইলাম। একদিন ছবি আর ভায়রাভাই মানে ম্যানেজার সাহেব বেড়াতে এলেন আমাদের বাসায়। খাওয়া দাওয়ার পর বসে গল্প করছি সকলে। একসময় মেনেজার সাহেব একটা বই বের

করে দিলেন আমার হাতে। বইটার নাম 'কসবার গুনিজন'। তাতে কসবার সব গুনীজনের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বভাবতই কাকার জীবনীটা আগে পড়লাম। সবশেষে লেখা হয়েছে, "তাঁর একমাত্র মেয়ে ছবি এখন নিউইয়র্কে। তার স্বামী জনাব ... কম্পিউটার সায়েন্সে এম, এস করার পর এখন একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর এরিয়া মেনেজার।"

এতদিন ছবির খাতিরে চুপ করে ছিলাম। এবার বোধ হয় আর চুপ থাকা গেল না। ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে, ধোকাবাজির একটা ধরন আছে - ইতিহাস বিকৃত করার দু:সাহস সহ্য করা যায় না। মেজাজটা একদম বিগড়ে গেল। বলে ফেললাম, 'এটা একটা ঐতিহাসিক বই। এর মাঝে অনেক ভুল তথ্য ছাপা হয়েছে। ওগুলো বাদ দেয়া উচিত। কোন বিবেকবান মানুষ ইতিহাস বিকৃত করতে পারে না।'

ম্যানেজার সাহেবের মুখটা কাল হয়ে গেল। ছবি প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলতে পারিনি - তুমি ধোকাবাজ, লম্পট, সমাজের কীট। ইতিহাস বিকৃত করার মত মানসিকতা ক্ষমার অযোগ্য। বলতে পারিনি কিছুই, কারণ আমি অজপাঁড়াগায়ের ক্ষ্যাত।

বছরখানেক পরের কথা। ছবির বাচ্চা হবে। তার পাশে একজন থাকা একান্ত প্রয়োজন। ম্যানেজার সাহেব চাচীকে ভিসা পাঠিয়ে দিলেন। আসলে ভিসা পাঠাননি। পাঠিয়েছেন হসপিটাল থেকে একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা: ছবি অসুস্থ, একজন সাহায্যকারি প্রয়োজন। এ দিয়ে ভিসা হয়ে গেল। আমেরিকার ভিসার ব্যবস্থা করা ম্যানেজারের পক্ষে কিছুই না। প্রমাণস্বরূপ ছবিকে ভিসা দিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছে। আমেরিকান দূতাবাস কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। এমন কি ছবিকে দূতাবাসেও যেতে হয়নি। ম্যানেজার সাহেব বলে দিয়েছেন তার ভিসা হয়ে গেছে। পাসপোর্টও কেউ দেখেনি। এখন দেশে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। চারদিকে রটে গেছে ম্যানেজার সাহেব সব শ্যালক এবং আত্নীয়স্বজন নিয়ে আসবেন আমেরিকায়। ভিসা কোন ব্যাপারই নয়।

একদিন চাচী এসে পৌঁছলেন অনেক মালপত্র সাথে নিয়ে। গায়ের রং দেখে কে বলবে বাঙ্গালীর মা! দুধে আলতা রং । খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। অটুট স্বাস্থ্য। সদা হাস্যোজ্জল। মনে হয় কোন দু:খ কষ্টই নাগালে পায়নি। আমার মাথায় হাত রাখতেই চোখের পাতা ভিজে এল।

ছবির ছেলে হয়েছে। নাম রাখা নিয়ে কি একটা ঝামেলা হচ্ছে। ছবির পাসপোর্টে যে নাম আছে তা ছবির নাম নয়। স্বামীর নামও ম্যানেজার সাহেবের নয়। এখন বাচ্চার পিতার নাম বাদ দিলে ছেলের নাম রাখতে হয় বেগম। এ নিয়ে চাচী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের নামগুলো নিয়ে এত ঝামেলা হল কেন?" আমি ক্ষ্যাত বলে বলতে পারিনি যে, ম্যানেজারের কথায় ছবির ভিসা হয়নি। ছবি এসেছে অন্যের পাসপোর্ট নিয়ে, অন্যের স্ত্রী হয়ে। বললাম, 'এ রকম হয় এ দেশে।"

চাচী এখন নাতীকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রতি সপ্তাহে চাচীকে দেখতে যাই। একদিন গিয়ে দেখি ম্যানেজার সাহেব নেই, ছবিও নেই । ঘরে আরও দুটা বাচ্চা। জিজ্ঞেস করলাম, কার বাচ্চা। চাচী বললেন, 'জামাইর এক বন্ধুর বাচ্চা, সকালে দিয়ে যায়, বিকালে নিয়ে যায়। ছবির বাচ্চা তো রাখতেই হয়। তার সাথে আর দুটা এমনি থেকে যায়।"

ওরা কি পয়সা দেয়?

তা ত জানি না।

ছবি কোথায়?

ছবি তো এখন কাজ করে। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ। জামাইর এক বন্ধুর ওখানে কাজ করে। সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এক মাস পর চাচী দেশে ফিরে যাচ্ছেন। টিকেট ওকে করা হয়ে গেছে। কেনাকাটাও শুরু করেছেন। কার জন্য কি নিতে হবে, কার কি বায়না আছে সব মুখস্থ। সবকিছুই কেনা হবে। সকলকেই খুশী করবেন।

পরের সপ্তাহে চাচীকে দেখতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় ছবির টেলিফোন পেলাম। চাচী অসুস্থ এবং হসপিটালে।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম চাচীর অবস্থা খুব খারাপ। একটা কীডনী নস্ট হয়ে গেছে। অপারেশন করতে হবে। তবে এখন যে অবস্থা তাতে অপারেশন করা যাবেনা। একটু ভাল হবার পর অপারেশন হল। এক মাস পর চাচী যখন ঘরে ফিরলেন তখন চেনাই যায়না। মাথার ঝাকড়া চুল একটাও নেই। শুকিয়ে একবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছেন। দুধে আলতা গায়ের রং এখন আগুনে পুড়া মনে হয়। বাড়ী ফিরে যাবার তারিখ স্থগিত হল।

এ সময় আমীর চাচা (ছোট চাচা শ্বশুর) বেড়াতে এলেন ফ্লোরিডায় তাঁর ছেলের কাছে। ওখান থেকে আমাদের এখানে। এসেই ফোন করলেন ছবিকে। ছবি বাসায় নেই। চাচীর সাথে কথা হল। চাচা বলে দিলেন জামাই এসেই যেন ফোন করে।

দুদিনেও যখন ম্যানেজার সাহেব ফোন করেননি তখন আমীর চাচা আমাকেই নিয়ে যেতে বললেন । আমি অনিচ্ছা সত্বে নিয়ে গেলাম। বাসায় গিয়ে চাচীকে দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। হঠাৎ করে মানুষের এমন পরিবর্তন হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। ঘরে আরও দু'টা বাচ্চা দেখে তিনি সবই বুঝতে পারলেন। চাচীকে তাড়াতাড়ি দেশে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে চলাফেরা করা ডাক্তারের বারণ । তাই আমির চাচা ভাল ডাক্তার দেখানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। ম্যানেজার সাহেবের খবর নিয়ে জানলেন যে তার কোন ছুটি নেই বলে যোগাযোগ করতে পারেননি। অথচ চাচা শনিবারেই চলে যাবেন। তিনি ম্যানেজার সাহেবের কাজের ঠিকানা নিয়ে রওয়ানা দিলেন পরামর্শের জন্য।

ঠিকানা মিলিয়ে ম্যানহাটানের ৩৪ স্ট্রিটের একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে চাচাকে নামিয়ে বললাম, এই সেই মালটিন্যাশনাল কোম্পানী। আমি অপেক্ষা করছি। ভিতরে গিয়ে খোঁজ করুন।

কয়েক মিনিট পর মুখটা একবারে কাল করে চাচা ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখা হয়েছে?

কয়েক মিনিট তিনি কথা বলতে পারেননি। হঠাৎ চিৎকার করে একটা গালি দিয়ে বললেন, 'ও তো হোটেল বয়! অথচ এ সব খবরাখবর আমি নিজে নিয়েছি। সব কিছু জানার পরই বিয়ে হয়েছে।

আমি টেলিফোন করে এখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কি কাজ করে। এখান থেকে বলেছিল যে, সে মেনেজার। বছরে ৫০ হাজার ডলার বেতন পায় সেই রকম একটা কাগজ দেখিয়েছে। এখন তো দেখছি সব ভুল আমারই হয়েছে ।

তা ঠিক। তিনি হয়ত ম্যানেজার। এ কথা মিথ্যা নয় হয়ত। এখানে কি আরও বাঙ্গালী কাজ করে?

তা জানিনা। তার অবস্থা দেখে আমার আর দাঁড়াতে ইচ্ছ হয়নি।

তাহলে আপনি বসুন। আমি দেখে আসি - বলে ভিতরে গিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম আরও কয়েক জন বাঙ্গালী আছে। ফিরে এসে চাচাকে বললাম, 'যারা বলেছে সে ম্যানেজার তারা মিথ্যে বলেনি। কারণ এসব দোকানে যারা কাজ করে সবাই ম্যানেজার অথবা এসিস্টেন্ট ম্যানেজার। কাজ একই। আর ৫০ হাজার ডলারের কাগজ দেখিয়ে থাকলে সেটা মিথ্যা। কারণ এসব দোকানের কর্মচারির বেতন সপ্তাহে ৫/৬শ ডলারের বেশি হয় না।

একটু পরেই ম্যানেজার সাহেব এলেন। চাচার সামনে দাঁড়াতেই তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'যত তাড়াড়ি পার ভাবীকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি অনেক দেশ ঘুরে দু সপ্তাহ পর ফিরব। তাই সাথে নেয়ে যেতে পারলাম না। শরীর ভাল হোক আর না হোক, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।' তারপর আমাকে বললেন, চল।

ফেরার পথে চাচা একটা কথাও বলেননি। মনে হল তার আপনজন কেউ মরে গেছে। বাসার সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি তো সহ্য করলাম এতবড় ধাক্কাটা, ভাইয়া শুনলে কি সহ্য করতে পারবেন? এত সাবধানতার পরও আমরা এমনভাবে ঠকলাম শুধু একজন মানুষের কারণে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে আবার কে?

সোনালী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার। ভাইয়ার বন্ধু। সেইই সব ব্যবস্থা করেছে। সে যা বলেছে আমরা তাই বিশ্বাস করেছি। ফিরে গিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করব।

আমি বললাম, কোন লাভ হবে না। কারণ তিনিও আপনাদের মত প্রতারিত। যা হবার হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই

পরদিন চাচা চলে গেলেন। এদিকে চাচী যাবার জন্য আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেনাকাটা প্রায় শেষ।

সেদিন চাচীকে দেখতে গেলাম। চা খেয়ে বসে কথা বলছি এমন সময় বাংলাদেশ থেকে ফোন এল চাচার ফোন। ছবির বাচ্চার কান্না শুনতে চান। চাচী অনেকক্ষন বাচ্চাটাকে কাঁদালেন এবং টেলিফোন মুখের কাছে ধরে রাখলেন। তারপর বললেন, 'দেখতে তো পারলেই না, কান্নাই শুন।"

বাড়ী ফিরে যাবার এক সপ্তাহ আগে চাচী আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাতারাতি সমস্ত শরীর ফুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়া হল। পরীক্ষার পর দেখা গেল অবস্থা খুব খারাপ। হার্টের একটা বাল্ব নস্ট হয়ে গেছে। আর একবার অপারেশন করলে ও বাঁচবেন না, না করলেও বাঁচবেন না ডাক্তার বলে দিয়েছে।

এখন বলতে গেলে মৃত মানুষকেই দেখতে যাই। ছবিকে জানানো হয়নি। আস্তে আস্তে বলতে হবে। শেষ হয়ে যাবার আগে একটা শেষ চেষ্টা করতে বললাম ডাক্তারকে। অপারেশন হল। পরদিন শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করলেন।

ঠিক সেদিন সন্ধ্যায় আমীর চাচার টেলিফোন পেলাম। "ভাইজান গতকাল হার্ট ফেল করেছেন"।

সময় মিলিয়ে দেখলাম। চাচীকে যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় ঠিক সেই সময় চাচাকেও হাসপাতালে নেয়া হয়। চাচী যে সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন চাচাও সে সময়ই চলে গেলেন চিরতরে। আমীর চাচা একটা খবর দিলেন, আমরাও আর একটা খবর বিনিময় করলাম।

গল্প এখানেই শেষ নয়! আরও একটু বাকী আছে বলে বাহার আবার শুরুর করল:

এবার চাচীকে দেশে পাঠাতে হবে সাজিয়ে। ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদে জানাজা শেষে সাজানো হল খুব দামী কফিনে যা বাংলাদেশে নেই। লাশ যেদিন ঢাকায় গিয়ে পৌঁছল সেদিন মানুষ আর কিছু দেখে নাই - অন্য কিছু জানার আগ্রহ নেই। শুধু কফিনটাই দেখেছে 'সোনার তৈরী কফিন! আমেরিকান ম্যানেজার! সাজিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি! কত লক্ষ টাকা খরচ করেছে কে জানে! টাকার তো অভাব নেই! জামাই হবে তো এমনি হবে! কফিনের আনুমানিক একটা খরচ অনেকেই তৈরী করে নিয়েছে। ঔষধ পথ্য ভাড়া সব মিলিয়ে কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে। জামাই আরও কি কি করেছে এমনি অনেক কাল্পনিক কাহিনী তৈরী হয়েছে মানুষের মুখে মুখে। ম্যানেজারের জয় জয়কার।

আমি ক্ষ্যাত। বলতে পারিনি যে, আমেরিকার সব কফিনই এক ধরণের। লাশ পাঠাতে হলে একটা কফিন লাগবে। এ ছাড়া আর কোন কফিন বাজারে নেই। তাতে ম্যানেজারের কোন কৃত্তিত্ব নেই। আমি বলতে পারিনি টাকা ম্যানেজারের লাগেনি। আমেরিকার হাসপাতালের খরচ দিতে হয় না। কোন ঔষধের খরচও দিতে হয় না। হাসপাতাল থেকেই দেয়া হয়। কাজ নেই বললে একটা ফান্ড থেকে সেই টাকা দিয়ে দেয়া হয়। লাশ পাঠাতে অনেক বাঙালী অনুদান দিয়েছে যা থেকে ম্যানেজার সাহেবের পকেটে বেশ টাকা সঞ্চিত আছে। তিনি লাশের ব্যবসায় বেশ মুনাফা করেছেন।

আমি ক্ষ্যাত। কিছুই বলতে পারিনি। বলবও না। কারণ আমি আর কয়জনের শত্রু হব!

গল্প শেষ হল। শ্রোতারা সবাই চুপ করে আছে। মালেক মামা বললেন, গল্পের কাহিনী অপূর্ব। কিন্তু আরও জীবন্ত করতে পারলে ভাল হয়। এই গল্প বাংলাদেশের কোন কাগজে ছাপা উচিত। মেয়ের বাবাদের চৈতন্য উদয় হোক। এখান থেকে বাংলাদেশে গিয়ে যত রকম হাই ফাই করুক, পাত্রের সব কিছু সঠিকভাবে না জেনে বিয়ে দেয়াটা একটা বোকামী।

আনিস একবার লতার মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল। মনে হল তার চোখের পাতা ভেজা।

-৪৯-

রেষ্টুরেন্ট মালিক আজরফের স্ত্রী মালেকা খুনের কাহিনী নিন্দুকেরা নিজেদের করে তৈরি করে নিয়েছে। কেউ বলে আজরফ খুন করিয়েছে, কেউ বলে আজরফ কিছুই জানে না। কেউ বলে বাসার চাকর রমজানকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে আজরফ। মাস ছয়েক আগে রমজানকে সে ভিসা দিয়ে এনেছে, সব খরচপত্র আজরফই দিয়েছে। টিকেটের টাকা দেবার ক্ষমতাও ছিলনা রমজানের। চারটা ছেলে মেয়ে নিয়ে বহু কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছিল বাংলাদেশের একটা গ্রামে। আজরফের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই রমজানকে আনা হয়েছিল। আবার কেউ বলে ইন্সুরেন্সের টাকার জন্যই খুন করেছে। যাক, এসব কথা কানে না তুলে বাংলা পত্রিকার খবরের দিকে তাকানো যাক।

বাহারের বাসায় আনিস একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখছিল খবরটা। তিনিজন শ্রোতাকে পড়ে শোনাচ্ছে।

পত্রিকায় লিখেছে মালেকার ভাই বাদী হয়ে একটি খুনের মামলা করেছে। একমাত্র আসামী মালেকার স্বামী আজরফ।

১৯৮৯ সালে আজরফ দেশে গিয়ে অনেক খুজে দেশের সেরা সুন্দরী মালেকাকেই পছন্দ করে। মালেকা তখন কলেজে ২য় বর্ষে। তখনও বিয়ে করার তার ইচ্ছে ছিলনা। আগে লেখাপড়া শেষ করবে, তারপর বিয়ের চিন্তা করবে। কিন্তু মিলিয়ন ডলারের মালিক আমেরিকান পাত্র যখন হাতের কাছে এসে দাঁড়াল তখন মালেকার অভিবাবকরা দিশেহারা হয়ে গেল। অনেক বুঝিয়ে তবে মালেকাকে রাজি করানো গেল। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই মালেকা চলে এল আমেরিকায়। তার কিছুদিন পর, আজরফের ক্ষমতার পরিধি প্রমান করার জন্য, মালেকার ভাইকেও ভিসা দিয়ে নিয়ে এল আজরফ।

মালেকার পরিবার খুব শিক্ষিত নয়। বাবা গ্রামের মোড়ল। টুপি মাথায় পান মুখে দিয়ে মুড়লি করে বেড়ায়। ছেলে কানন চট্রগ্রামে চাকরি করে। মাসে মাসে টাকা আসে। প্রতি মাসে যা আসে তা তার বেতনের চেয়ে অনেক বেশি। মালেকা শহরে তার খালার কাছে থেকে কলেজে পড়ে। বিয়ের পর সব ছেড়ে চলে আসতে হল নিউইয়র্কে।

নিউইয়র্কে এসে সে বায়না ধরল লেখাপড়া করবে। সে উচ্চাভিলাষি। স্বাবলম্বী হতে চায়। স্বামী কোটিপতি বলে সে তার উপর নির্ভর করে চলতে চায়না। আজরফ বলেছিল, ঠিক আছে। নিজের রোজগারে নিজেই চল। রেষ্টুরেন্টে কাজ কর। সব দায়ীত্ব তুমি লও, তোমার যত ইচ্ছা তত বেতন নাও। তোমার নিজের ব্যবসা। সবই তো তোমার। মালেকা বলেছিল, লেখাপড়ার সাথে টাকার একটা সম্পর্ক আছে মানি। লেখাপড়া শেষ করে টাকা রোজগার করতে হয়। যারা টাকার পেছনে ছুটে তাদের লেখাপড়া হয়না। মাত্র তো চার বছর। তারপর তোমার রেষ্টুরেন্টের দায়ীত্ব নেব। এখন আমি লেখাপড়া শেষ করতে চাই।

কলেজে ভর্তি হবার পর মালেকা অনুভব করল তার একটা গাড়ী না হলে চলেনা। সে ড্রাইভিং পরিক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিল। তারপর একটা গাড়ী। মিলিয়ন ডলার ম্যানের স্ত্রীর গাড়ী হবে সেই অনুপাতে। তাই তাকে মার্সিডিস গাড়ী কিনে দিল আজরফ। মালেকা তার নিজের গাড়ী নিয়ে কলেজে যায়, যখন তখন বাইরে যায়। প্রয়োজনে কেনা কাটা করে। ঘরের কাজ করার তার সময় হয়না। পড়া নিয়ে ব্যস্থ থাকে। আজরফ মালেকার সব চাহিদা পূরণ করে। ঘরের কাজ আজরফই চালিয়ে নেয়। ওদিকে আবার ব্যবসাও তদারকি করতে হয়। আজরফ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আাগের চেয়ে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। নিজকে সে প্রবোধ দেয় এই ভেবে যে, নিজে তো লেখাপড়া করতে পারিনি। মালেকা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। ভবিষ্যত সন্তানের শিক্ষিত মা তাদের ভবিষ্যত তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মালেকার লেখাপড়া ঠিকভাবেই চলছে।

দ্বিতীয় বর্ষেই লক্ষ্য করল মালেকার মাঝে অনেক পরিবর্তন। তার অনেক বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে। যখন তখন বাসায় আসে বন্ধুরা। একে তো সুন্দরী, তায় আবার মার্সিডিস গাড়ী, মিলিয়ন ডলার ম্যানের স্ত্রী, বন্ধু জুটতে দেরী হযনি। এশিয়ান আমেরিকান অনেক রকমের বন্ধু। ইদানিং মালেকা সিগারেট খাওয়া শিখেছে। বন্ধুদের অনুরোধে। এখন দৈনিক এক প্যাকেট কিনে। এসব দেখে আজরফ ভয় পেয়ে গেল। একদিন জিজ্ঞেস করল, তুমি সিগারেট খাওয়া শুরু করেছ?

এটা এমন কিছু না। এদেশে মেয়েরা সিগারেট খায়। কারণ সিগারেটটা তো আর পুরুষের একচ্ছত্র সম্পত্তি নয়।

আজরফ কথা বাড়ায়নি। ইদানিংকালে মালেকা আগের মত ব্যবহার করেনা। যখন তখন তাকে জড়িয়ে ধরে না। কি খেয়েছে সারাদিন তা জানতে চায় না। সময় হয় না। মাঝে মাঝে অনেক দেরীতে আসে ঘরে। জিজ্ঞেস করলে বলে, লাইব্রেরীতে কাজ ছিল।

আজরফ রেষ্টুরেন্টে যায় সকাল দশটা এগারটায়। যাবার আগে ঘরের টুকটাক কাজগুলো সেরে যায়। ফিরে রাত দশটায়। আসার পথে দু'জনের খাবার নিয়ে আসে। মালেকার পছন্দের খাবার। মালেকা বেশিরভাগ দিনই খায় না। বলে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে।

একদিন বেলা দু'টার সময় আজরফ ঘরে এল। চেক বুক ফেলে গেছে ভুলে। এসে দেখে মালেকা ঘরে। তার এক ইন্ডিয়ান বন্ধুর সাথে গল্প করছে। এই অসময়ে তার ক্লাশে থাকার কথা আজরফ জানে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে আজরফ বাসায় আসে দেখার জন্য। দেখে প্রায়ই মালেকা ঘরে। নতুন নতুন বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

মালেকার সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে দিন দিন। সে এখন রাত করে ঘরে ফিরে। কোন দিন দশটা, কোনদিন বারটা। একদিন ফিরল রাত তিনটায়। টলমল অবস্থা। মুখে মদের গন্ধ ভুর ভুর করছে। আজরফও মদ খায়। তবে মাত্রা ছাড়ায়না। মালেকা যেভাবে মদ খেয়েছে সে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আজরফ প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, তুমি এ অবস্থায় ড্রাইভ করে এসেছ?

না, আমার এক বন্ধু ড্রাইভ করে দিয়ে গেল।

তুমি তো সব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এসব তো বন্ধ করতে হবে। তোমার আর লেখাপড়ার দরকার নেই। কলেজে যাবার আর প্রয়োজন নেই।

কি বল তুমি? তুমি নিজে একজন অশিক্ষিত। আমাকে লেখাপড়া করতে দিতে চাওনা। তুমি খরচ না দিলে আমি পার্ট টাইম কাজ করে পড়া চালিয়ে যাব। বন্ধ করব না।

আজরফ অনেক বুঝাতে চেষ্টা করল। শুধু লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাক। বন্ধুবান্ধব বাদ দাও। কিন্তু মালেকা সম্পুর্ন বদলে গেছে। সে এখন আমেরিকান। আমেরিকান জীবন পছন্দ করে।

তার কিছুদিন পরই আজরফ দেশে গেল। ফিরে এসে রমজানের ভিসার ব্যবস্থা করল।

রমজানের বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে। তার কাজ হল ঘরের সব কাজ কর্ম, রান্না বান্না করা। মালেকার দিকে খেয়াল রাখা। তার ফাই ফরমাস পালন করা।

মালেকা রমজানকে ভাল চোখে দেখেনি। সব কিছুতেই খুঁত ধরে। তাকে যখন তখন বাইরে বাজার করতে পাঠিয়ে দেয। বিশেষ করে মালেকার বন্ধু যখন বাসায় আসে। রমজানকে একটা কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মালেকা তখন বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিন দোকান থেকে মেহমানের জন্য সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে দেখে মেহমান বেড রুম থেকে বেরিয়ে আসছে। মালেকা তখনও বেডরুমে।

তার ঠিক ছয় মাস পরই মালেকা খুন হয়।

আদালতে খুনের আলামত পরিষ্কার। একজনই খুন করেছে। আর সে খুনি হল রমজান। রমজান নিজেই স্বীকার করেছে। কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। তাই আদালতের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। অল্পদিনের মধ্যেই রায় হয়ে গেল। রমজানের বিশ বছরের জেল।

কিছু দিন পরই আজরফ অর্ধ মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেল। মালেকার জীবন বীমার টাকা। বীমার টাকার বেনিফিসিয়ারী আজরফ। মালেকার

জীবনের দাম আধা মিলিয়ন ডলার। স্বামী হিসেবে আজরফ এ টাকার মালিক। তার মিলিয়নের সাথে আরও আধা মিলিয়ন যোগ হল। পৃথিবীর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু মালেকার ভাই আজরফ রেষ্টুরেন্টের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সে বলছে অন্য কথা।

তার কথা হল রমজান জেলে গিয়ে বেঁচেছে। তার পরিবারের একটা উপায় হয়েছে। সে বাইরে থাকলে তার পরিবারের ভরণপোষনের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এখন দেশে তার পরিবার রাজার হালে চলছে। টাকার অভাব নেই। তাদের বাড়ীতে ইমারত তৈরি হচ্ছে, বাজারে দোকান দিয়েছে। রমজানের একটা ছেলে আর এক বছর পর আমেরিকার ভিসা পাচ্ছে। সব ছেলে মেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে। এসব নাকি আজরফ দিচ্ছে।

আনিস জিজ্ঞেস করল, এখানেও কি কোর্টে টেবিলের নীচে হাত চলে?

বাহার উত্তর দিল, এখানে যে কি হয় তা বুঝা মুস্কিল।

বিন্দু জিজ্ঞেস করল, আজরফের দাঁড়ি আছে?

বিন্দুর ধারনা হল যারা অল্প বয়সে দাঁড়ি রাখে তাদের দাঁড়ির নীচে অপরাধ লুকিয়ে থাকে।

বাহার বলল, না, আজরফের দাঁড়ি নেই।

দাঁড়ি ছাড়াও কত খুনি এমনিভাবে পার পেয়ে যায় কে জানে!

-৫০-

বাহার বাড়ী কিনেছে। ওজন পার্কে। গৃহপ্রবেশ হল একটি বিশেষ সাহিত্য আসর দিয়ে। কবি শামসুর রাহমানের ৬৭তম জন্মদিন পালন করে। ভাগ্যক্রমে কবি তখন নিউইয়র্কে। অনেক গন্যমাণ্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হলেন। আনিস, আমান এবং লতাও বাদ যায়নি। আসর পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার সালেক খান। সারাদিন কবিকে নিয়ে চলল সাহিত্যের আসর, গান বাজনা আর আনন্দ ফুর্তি। দিনের শেষে কবির মন্তব্য হল, 'আমি মনে করি ঢাকা কলকাতার পরই নিউ ইয়র্ক হবে সাহিত্য চর্চার তৃতীয় স্থান"।

এই সারাদিনের ব্যস্ততা এবং আনন্দে লতা সব সময় আনিস থেকে দূরে থেকেছে। বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত রয়েছে বিন্দুকে সাহায্য করে। আনিসের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে অনিচ্ছায়। মনে হয় আনিসকে সে চিনেই না।

এই আনন্দ উৎসবে একজন যোগ দিতে পারেনি। সে বিন্দু। আজকে গৃহপ্রবেশের কালে তার চোখে জল। সাগরের জন্য। এতদিন কত কষ্ট করে ছেলেটা লেখাপড়া করল। একটা রুমে তিনটা বাচ্চা থাকত। লেখাপড়ার আলাদা কোন জায়গা দিতে পারেনি সাগরকে। এখন সে ডর্মে চলে গেছে আর নিজের বাড়ী হয়েছে। এখন রুমের অভাব নেই। আর সাগর নেই। এ বাড়ী দিয়ে তার প্রয়োজন নেই! আবার আনন্দ কিসের!

তার দু সপ্তাহ পরেই বাহারের বাসায় একটা সালিশ বসল।

ফরিয়াদি তপু। অভিযোগ দীপকের বিরুদ্ধে। কয়েকজন সংগঠন নেতা, দীপকের কিছু বন্ধু মিলে প্রায় দশ জন আমন্ত্রিত হয়েছে তপুর দ্বারা। বাহারের অনুমতি নিয়েই এই সালিশ ডাকা হয়েছে বাহারের বাড়ীতে।

দীপক বাড়ী কিনেছে প্রায় এক বছর। একটা সুন্দর ছিমছাম দোতলা বাড়ী। এক তলায় লিভিং রুম, কিচেন আর ছোট একটা বারান্দা

ব্যাকইয়ার্ডে। দোতলায় চারটা বেডরুম, ছোট্ট একটা বারান্দা। লাল ইঁটের তৈরী। দাম দুই লক্ষ ষাট হাজার ডলার। ডাউন পেমেন্ট দিয়েছে ১০% মানে ২৬ হাজার। ক্লোজিং সহ আনুষঙ্গিক খরচ হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার।

দীপক কাজ করে একটা ঔষধের দোকানে। চেইন ষ্টোর। নামকরা ষ্টোর 'ডু এন্ড রীড'। বেতন যা পায় তা দিয়ে কোন রকমে কায়ক্লেশে চলে। এখানে আছে প্রায় চার বছর। দুটা ছেলেমেয়ে। স্ত্রী সুন্দরী বলে বাইরে কাজ করতে দেয়না। দীপক মাঝে মাঝে ওভারটাইম করে ঘাটতি পুষিয়ে নেয়। সপ্তাহে ৫ দিন কাজ বলে হাতে যথেষ্ট সময় থাকে। সামাজিক প্রায় সব অনুষ্ঠানে থাকতে চেষ্টা করে। কথা কম বলে। সামাজিক কাজকর্মে নিজকে ব্যস্ত রাখে। অন্যের সাহায্যে যখন তখন এগিয়ে আসে। সকলেই জানে দীপক একজন স্বল্পভাষী হিসেবী লোক। তাই একজনের রোজগার দিয়েই সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। বাড়ী ভাড়ার অঙ্কেও সেই নেই। তার বাসায় কোন বাড়তি মানুষ নেই।

হঠাৎ করে বাড়ী কেনার ব্যাপারটা অনেকেই অঙ্ক মিলাতে পারছে না। ওদের হিসেবে দীপকের যা আয় হয় তা থেকে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। যদি সঞ্চয় হয়েই থাকে তাহলে মাসে কত টাকা হতে পারে, এই তিন বছরে মোট কত টাকা হবে এসব হিসাব নিয়ে অনেকে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে। কারণ অন্যের উন্নতির কারণ খুঁজে বের করা আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া অনেকের আবার গাত্রদাহের অভ্যেস থাকে। অনেক অনুসন্ধান করেও কেউ কোন কূলকিনারা পায়নি। দীপকের টাকার উৎসটা বের করা যায়নি।

এই ঘটনার মাস ছয়েক পর জানা গেল এই টাকার উৎস। এটা আর এক ধরণের ব্যবসা। শুরু হয়েছে বাংলাদেশ থেকে।

তপু এই স্বপ্ন নগরে পদার্পন করেছিল ব্যবসায়ী হিসাবে। ভিজিট ভিসায়। একজন গার্মেন্টিস ইন্ডাষ্ট্রির মালিক হিসাবে এদেশে ব্যবসা সম্প্রসারন করার মানসে। বিজনেস ভিসা পেতে হলে কি কি কাগজ প্রয়োজন হয় তা যোগাড় করে তিনি ভিসা পেয়ে গার্মেন্টেসের অনেক নমুনা নিয়ে খুব সহজেই নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছেন। বিশ্বের সকল ব্যবসার কেন্দ্রস্থল নিউইয়র্ক। তপু নমুনা নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কোন অর্ডার যোগাড় করতে পারেনি। অবশেষে নিজেই নমুনা হয়ে একটা পিজার দোকানে কাজ করে। পিজা তৈরি করে। সপ্তাহে চার/পাঁচ শ ডলার কামায়। এক বছরে বেশ টাকা জমেছে। কোন কাগজপত্র নেই। এখন মাথায় শুধু রুবীর চিন্তা। নতুন বিয়ে করা বউটা ফেলে এসেছে দেশে। নিজের চলে গেলে আর একবার আসা যাবেনা। রুবীকে কিভাবে আনা যায় সেই চিন্তা রাতদিন। দেশে রুবী এবং তার আত্নীয়স্বজনকে বলে রেখেছে যে যদি কোন সরকারী কর্মকর্তা সরকারী সফরে আসে তাহলে যেন তপুকে খবর দেয়। টাকা যা লাগে সেই কর্মকর্তার সাথে যেন নিয়ে আসে।

সেই মোতাবেক পেয়ে গেল। একজন মন্ত্রী যাচ্ছে নিউইয়র্ক। সরকারী কাজে। তার সাথে তার মেয়ে বলে ভিসা পেয়ে গেল। অবশ্য এই ব্যবস্থাটা করতে তপু একদম খালি হয়ে গেল। এক বছরের কামাই শেষ। মন্ত্রীমহাশয়কে দিতে হয়েছে বাংলা টাকায় পাঁচ লাখ। সেই টাকার বিনিময়ে মন্ত্রি মহাশয় সরকারি কাজ করে গেলেন। রেখে গেলেন তার কথিত মেয়ে রুবীকে। তপু রুবীকে পেয়ে টাকার জলুনিটা ভুলে গেল। নতুন করে আবার টাকা রোজগার করতে লাগল। রুবী আসার পর বাসা নিল দীপকের বাসার পাশে। দুজনে গলায় গলায় ভাব। দীপকের স্ত্রী

আর রুবী হয়ে গেল ননদ ভাবী। দুসংসার একবারে একই সূত্রে গেঁথে গেল।

দীপক এদেশের নাগরিক। কাগজের কোন চিন্তা নেই। তপু আর রুবীর কারও কাগজ নেই। তপু একদিন দীপককে বলল, দীপকদা, তুমি তো আমাদের হেলপ করতে পার কাগজের ব্যাপারে।

কিভাবে?

তুমি রুবীকে তোমার স্ত্রী হিসাবে দরখাস্ত করতে পার। রুবীর কাগজ হয়ে গেলে রুবী আমাকে স্পন্সর করবে। আমাদের ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।

তাহলে তোমার বৌদির কি হবে?

বৌদি বৌদির জায়গায় আছে, থাকবে। শুধু কাগজে পত্রে দেখিয়ে দেবে ডাইভোর্স। তারপর রুবীকে স্ত্রী হিসেবে দেখিয়ে দরখাস্ত করে দাও। এর জন্য আমি তোমাকে খরচ হিসেবে ২৫ হাজার ডলার দিতেও রাজি আছি।

দীপক কথাটা চিন্তা করল অনেক ক্ষণ। মানুষের উপকার করতে পারলে সে নিজে খুশি। ভাবল, ওদের কারও কাগজ নেই। এভাবে যদি কাগজ হয়ে যায় তো মন্দ কি? তাছাড়া এখানে একটা অঙ্কের ব্যাপারও আছে। বেশ লোভনীয় প্রস্তাব। বলল, আমি তোমার বৌদির সাথে পরামর্শ করে দেখি।

পরামর্শ করে দীপক বলল, ঠিক আছে। যা করতে হয় তুমিই করবে। আমাকে ঝামেলায় ফেলবে না কিন্তু। কি করতে হবে তুমিই কর।

আমি এক উকিলের সাথে আলাপ করেছি। তাতে কোন ঝামেলা হবার কথা নয়। একদম সোজা।

তারপর উকিলের মাধ্যমে দীপক তার স্ত্রীকে তালাক দিল। রুবীকে বিয়ে করে দরখাস্ত করে দিল।

ইমিগ্রেশনের মানুষগুলো আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে। এ ধরনের মামলা বোধ হয় আরও জমা হয়েছে। তার দরখাস্ত ডিনাই হয়েছে। ইন্টারভিউ ছাড়াই। সোজাসুজি নাকচ করে দিয়েছে।

যাক, যার যার বউ তার তার হাতেই আছে। কাগজে যাই থাক। কোন ঝামেলা হবার কথা নয়। দীপক তো আর রুবীকে দাবী করছেনা। কিন্তু গোল বাঁধল টাকাটা নিয়ে। পচিশ হাজার ডলার! তপু দীপককে বলল, তুমি তো চেষ্টা করলে। কপালে নেই আর কি করা যায়। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।

এবার যার যার চেহারা বেরিয়ে এল। টাকা তো খরচ হয়ে গেছে। এই টাকা দিয়ে বাড়ীর মালিক হয়েছে। টাকা তো ফেরত দেয়া যাবেনা। দীপক বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার যেন কোন ঝামেলা না হয়। তুমিই এই কুবুদ্ধি দিয়েছ। টাকা নিয়ে আমি তো তোমার সাথে বেঈমানি করিনি। যেভাবে বলেছ সেভাবে কাজ করেছি। আমার দোষটা কোথায়? টাকা খরচ হয়ে গেছে। ফেরত দিতে পারবনা।

এক কথা, দু কথা। বাড়তে বাড়তে কথা ঘরের বাইরে চলে গেল। আর তখনি বাইরের মানুষ জানতে পারল দীপকের বাড়ী কেনার কেচ্ছা। কেউ তিলকে তাল করে, কেউ তালকে তিল করে কথা ছড়াচ্ছে। এখানে সেখানে মুখরোচক গল্প হচ্ছে। তপু নিরুপায়। টাকার কোন রশিদ নেই। প্রমাণ নেই। কোন কোর্টে যাওয়া যাবেনা। কাজের কাজ হলনা! এতগুলো টাকা! এভাবে তো ছেড়ে দেয়া যায়না। যখন তখন দীপকের কাছে যায়। তর্ক হয়। এক সময়ের গলায় গলায় ভাব এখন দা কুড়াল সম্পর্ক হয়েছে। সব রকমের যুক্তি তর্ক দেখিয়ে যখন দীপককে রাজী

করানো যায়নি, তখন তপু শাসিয়ে দিল। বাংলাদেশে তোমার গুষ্টি শেষ করে দেব! এখনও সময় আছে! টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও! তাতে কাজ তো হয়ইনি, উল্টো আরও বিপদে পড়ল তপু।

দীপক বলল, কাগজে পত্রে এখন রুবী আমার স্ত্রী। আর আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রী। তোমার ছেলেমেয়ে নেই। তাই তোমার স্ত্রী সন্তানের ভরনপোষন দাবী করতে পারবে না যা আমার স্ত্রী করতে পারবে। আমি সে সব ঝামেলায় যাবনা। টাকাও ফেরত দেবনা। তুমি যা পার তাই কর।

তপু স্থির করল শালিস বসাবে। বাঙালীদের নিয়ে। সেই সালিসে আমন্ত্রিত সকলেই উপস্থিত হলেন। দীপক ছাড়া।

চা পর্ব শেষ করে অতিথিরা অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে বিদায় নিল। আনিস বলল, দীপককে ধরে আনা যায় না?

না, এটা আইনের দেশ। বাহার বলল।

-৫১-

সামনেই পিঙ্কির ফাইনাল পরিক্ষা। আনিসকে বলল, পরিক্ষা শেষ হয়ে গেলে তো আর কলেজে আসব না। তাহলে আমাদের দেখা হবে কি করে? তুমি ত আরও এক বছর আছ কলেজে।

আনিস বলল, তুমি চলে এসো যখন সময় পাবে। তাহলেই দেখা হবে।

এভাবে কি যখন তখন আসা যায়? দেখি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার চাকরি হয়ে গেলে তো আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তখন কি হবে?

তখন বাসা বদল করে আমার বাসার পাশে ভাড়া নিবে, তাহলেই দেখা হবে বলে আনিস হেসে ফেলল।

চাকরি হলে তো আমি আলাদাই থাকব। মা বাবার সাথে থাকব না। তখন দু'জনে এক সাথেই থাকব।

তোমার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি!

সেদিন পিঙ্কি বাড়ী ফিরে তার মাকে বলল, মা, তুমি বলেছিলে ইন্ডিয়ান ছেলে পছন্দ করতে। আমি একজন ইন্ডিয়ানকে পছন্দ করেছি।

শুনে নির্মলা খুব খুশি হলেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিয়ে বললেন, আমি জানতাম, আমার মেয়ে আমাকে অখুশি করবে না। কোথায় সে ছেলে? কি করে? কি নাম তার?

তার নাম আনিস।

আনিস? তাহলে মুসলমান? তুমি মুসলমান ছেলে পছন্দ করেছ?

মুসলমান? মুসলমান কি? সে ত ইন্ডিয়ান। তুমি বলেছিলে ইন্ডিয়ান ছেলে পছন্দ করতে। তাই তো করেছি। মুসলমান কি তা বলনি! এখন তোমার প্রবলেমটা কি?

এই ছেলে তো ভিন্ন ধর্মের! আমাদের ধর্মের নয়! ইন্ডিয়ান হলেও সে আর এক ধর্মের।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানই। তার আবার ধর্ম কি? তুমি তো ধর্মের কথা আগে বলনি! এসব আমি বুঝি না। আমি আনিসকে পছন্দ করি। তাকে বিয়ে করতে চাই।

না, এ বিয়ে হবেনা! তুমি হিন্দু ছেলে দেখ।

বিয়ে হবে না? কেন?

ওরা বিধর্মী। নিজের ধর্মের ছেলে হতে হবে। হিন্দু হতে হবে।

তাহলে কি তোমরা ইন্ডিয়ান নও? এতদিন তো বললে তোমরা ইন্ডিয়ান। এখন আবার হিন্দু বল কেন? এত বছরে একজন হিন্দুর

সাথেও আমার পরিচয় হয়নি। ইন্ডিয়ান, চায়নীজ, গায়ানীজ, আফ্রিকান, অ্যারাবিয়ান অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে। হিন্দু তো পাইনি একজনও। হিন্দুর কথা তো তুমি আগে বলনি। হিন্দু আর মুসলমানে তোমার অসুবিধাটা কোথায়? আমার একটা হলেই চলে। বিয়ে তো করব আমি। আমার পছন্দ দেখতে হবে। তোমার পছন্দ দিয়ে আমি বিয়ে করব কেন? তুমি তাহলে একটা হিন্দু নিয়ে আস। দেখি আমার পছন্দ হয় কিনা।

তাইত! নির্মলা প্রতিটি পূজা অনুষ্ঠানে যান। সেই ১৯৬৬ সাল থেকে যখন প্রথম সরস্বতি পূজা শুরু হয় তখন থেকেই। তারপর শুরু হল দূর্গাপূজা। ১৯৭০ সাল থেকে দূর্গাপূজা শুরুর পর থেকে তিনি একবারও বাদ দেননি কোন পূজা বা পূজার অনুষ্ঠান। পূজা সমিতি হয়েছে। একটা ভেঙ্গে কয়েকটা হয়েছে। একই দেবতা এখন ভাগ হয়ে গেছে। নাকি দেবতা সবখানেই এক। এসব চিন্তা মিসেস সেনকে ভাবিয়ে তোলে। দেবতা যাতে বাদ না পড়ে তাই তিনি সব সমিতির পূজাতেই যান। কালি মন্দিরে যান। এপার বাংলা ওপার বাংলার সব দেবতাকে পূজো দিতে যান। কেউ যেন বাদ না পড়ে। প্রার্থনা করেন। পিঙ্কির জন্য একটা ধর্মপরায়ন নিষ্ঠাবান পাত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। নিজের বাড়ীতেও পূজার সব ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন আরাধনা শেষে একটি ইন্ডিয়ান পাত্রের জন্য ভগবাণের কাছে প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে গিয়ে মনে মনে ছেলে খোঁজেন। কিন্তু বিয়ের উপযুক্ত কোন ছেলেই পূজার অনূষ্ঠানে খুব একটা আসে না। যারা আসে তাদের বিয়ের বয়স হয়নি। দুএকটা ছেলে যাও পাওয়া গেছে তাতে সুবিধা হয়নি। কেউ হয়ত ইন্ডিয়ান পছন্দ করে না। কারওর ভাল চাকরি নেই। কেউ পড়াশুনা করছে। এদিকে পিঙ্কির বিয়ের বয়স হয়ে গেছে অনেক আগেই। সেন বাবু এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি বলেন, মেয়ের ব্যাপার সে নিজেই ঠিক করে নেবে। আমরা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সে এদেশে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শেষ করে নিজের দায়িত্ব নিজে নেবে। নিজেই বুঝে নেবে কিসে সে সুখি হবে। তার সিদ্ধান্ত তাকে নিতে দাও। তাই তিনি কোন ছেলে খোঁজেন না। সমস্ত মাথা ব্যথা নির্মলার।

এবার তিনি কি উত্তর দেবেন? তিনিও তো ইন্ডিয়ান হিন্দু সুপাত্রের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তিনি চুপ করে রইলেন।

পিঙ্কি বলল, আমি আনিসকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। তুমি দেখ। খুব ভাল ছেলে, খুব নম্র, ভদ্র। এই বলে পিঙ্কি তার ঘরে চলে গেল। নির্মলা কিছুই বুঝতে বা বলতে পারলেন না।

পরের দিন পিঙ্কি আনিসকে বলল, কলেজ শেষে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাবে আমার সাথে। মা তোমাকে দেখতে চায়।

আনিস কোনদিন পিঙ্কিদের বাসায় যায়নি। বলল, কেন? বিশেষ কোন অনুষ্ঠান আছে নাকি? আগে তো বলনি।

আই ওয়ান্ট টু মেরি ইউ! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। মাকে বলেছি। মা তোমাকে দেখতে চায়।

আনিস আকাশ থেকে পড়ল। বলে কি পাগলি! বিয়ে করতে চায়? কোনদিন তো ঘুণাক্ষরেও তাদের মাঝে বিয়ের কোন আলাপ হয়নি। পিঙ্কি বিয়ের কথা চিন্তা করল কি করে? কি কারণে তার এ ধারণা জন্মাল? বোকার মত কিছুক্ষন চেয়ে থেকে আনিস বলল, তুমি কি আমার সাথে কৌতুক করছ?

নো, আই এম সিরিয়াস! আমি সিরিয়াসলি বলছি। আমি তোমাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি!

বল কি! আমার কোন মতামত জানতে চাইলে না? তার আগেই তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ! আমি এখন বিয়ে করব কিনা তা জিজ্ঞেসও করনি একবার!

কেন, তোমার অসুবিধাটা কি? আমি তো চাকরি শুরু করব। তুমি তোমার কোর্স শেষ করবে, তারপর দুজনেই চাকরি করব!

ব্যাপারটা তো চাকরি নয়। আমি তো বিয়ের জন্য প্রস্তুত নই। তুমি কি করে বুঝলে যে আমি বিয়ে করব? আমার অনেক কাজ বাকি। আমি এখন বিয়ে করবনা। বিয়ে করার চিন্তাও করছিনা এখন। তার আগে আমার একটা চাকরি, মা'কে এদেশে না আনা পর্যন্ত আমি বিয়ে করব না।

কবে বিয়ে করবে চিন্তা করছ? আমি অপেক্ষা করব।

আমার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমার ইচ্ছে অন্যরকম।

তাহলে কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনা?

ঠিক ধরেছ।

বিয়ে করবে না! তাহলে আমার সাথে এমনভাবে বন্ধুত্ব করলে কেন? আমি যা চেয়েছি তুমি তাই করেছ! তাতে প্রমাণ হয় যে তুমি আমাকে ভালবাস। আমাকে তুমি চাও! কিন্তু বিয়ে করবেনা শুধু মজা করেছ!

আমি কোথায় মজা করলাম? আমরা তো এমন কিছু করিনি যাতে বিয়ে করার প্রশ্ন আসতে পারে। আমরা কোন সীমা অতিক্রম করিনি কোন দিন। শুধুই বন্ধুত্ব। তোমার অন্য বন্ধুদের সাথে যেমন ব্যবহার কর আমার সাথে তার চেয়ে বেশী নয়। এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তুমি বিয়ে করার চিন্তা করলে কেন! চিরকাল কি আমরা শুধুই বন্ধু হয়ে থাকতে পারি না? যেমন তোমার অন্য বন্ধুদের সাথে তুমি কোলাকুলি কর, চুমো দাও। আমিও তো ঠিক তেমনি ভেবে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছি। তার বেশী নয়। তুমি হিসাবে ভুল করছ। আমরা বন্ধু, বন্ধুর মতই থাকতে চাই। এর বেশী নয়।

পিঙ্কি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আনিসের দিকে। তারপর টলমল চোখে নীরবে চলে গেল। আনিস তার গমণ পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার কিছুদিন পর পিঙ্কি এসে তার মা'কে বলল, আমি ব্রায়ানকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। ইট ইজ ফাইনাল। তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা কর। ব্রায়ান রাজি।

ব্রায়ান? ওটা আবার কে?

আমার ক্লাশমেট। আমরা একজনকে আর এক জন ভালবাসি। ব্রায়ানের চাকরি হয়েছে। আগামী মাসেই সে চলে যাবে। যাবার আগেই বিয়ে শেষ করব। তারপর আমিও তার সাথে চলে যাব। এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ব্রায়ান কোন্ জাতের? সে কি খৃষ্টান? না হিন্দু?

তা ত জানি না। কিন্তু সে ইন্ডিয়ান নয়। সে আমেরিকান।

নির্মলার মনে হল তার সব শেষ হয়ে গেল। মুসলমান ছেলে পছন্দ করেছিল। রাজি হয়নি বলে আর কোন দিন আনিসের কথা শোনা যায়নি। তিনি মনে করেছিলেন মুসলমান বাদ দিয়ে হিন্দুর কথা ভাবছে বোধ হয়। পিঙ্কি আর কোন দিন আনিস সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। ইন্ডিয়া থেকে উচ্চশিক্ষার্থে আগত বেশ কয়েক জন হিন্দু ছেলের সাথে পিঙ্কির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। দু একজনকে বাসায় দাওয়াত করে পিঙ্কির সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। এসব ছেলে পিঙ্কির পছন্দ নয়। বলেছে সবগুলো নাট। এসব দিয়ে তার চলবেনা। একজনের সাথে আলাপের পর পিঙ্কি বলল, হি ইজ লাইক মাই ডেড। সে আমার বাপের মত।

এখানে এত এত ছেলে থাকতে তিনি ভাল একটা ছেলের সন্ধান করতে পারেননি। এ তাদেরই ব্যর্থতা। আজ ব্রায়ানের কথা শুনে তিনি অবশ হয়ে গেলেন। তাহলে তো মুসলমানই ভাল ছিল। অন্তত ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ার স্বভাব চরিত্র পাওয়া যেত। এখন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের কে একটা ব্রায়ান হবে তার মেয়ের জামাই! তিনি ভাবতেই পারেন না। তার সারা জীবনের ধর্মকর্ম আর দেবতার কাছে এত আবেদন নিবেদন সব বৃথা গেল! কোন দেবতাই কি তার এ আকুতি শুনেনি?

অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একটা মুসলমান ছেলের কথা বলেছিলে। সেই ছেলে কোথায়?

ডন্ট টক এবাউট হিম! তার সম্বন্ধে কথা বলো না। সে চলে গেছে।

এইযে ব্রায়ান না কি নাম বললে, সে কি খৃষ্টান?

আমি জানি না। তবে সে গড বিশ্বাস করে। তোমরাও তো গড বিশ্বাস কর। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? তোমরা যে গড বিশ্বাস কর সেও সেই গডকে বিশ্বাস করে। খৃষ্টান আর হিন্দুর মাঝে তফাতটা কোথায়? গড তো একই। বিভিন্ন ধর্ম আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান। সকলের কাজ তো একই। পূজা করা। একই গডের। তাহলে এতগুলো ধর্মের প্রয়োজনটা কি? একটা ধর্ম হলেই তো সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়। এক সাথে সবাই মিলে একই গডের পূজা করা যাবে। আমাদের বিয়ে চার্চেই হবে ঠিক করেছি।

নির্মলা নিরুপায়। তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। সেন বাবু শুনে বললেন, এটা আমেরিকা। মেয়ে এখানে জন্ম, এখানকার কালচারে বড় হয়েছে। এটা তার নিজের দেশ। ইন্ডিয়াকে মনে করে তার বাবামায়ের দেশ। তার নয়। কাজেই তার ব্যাপারে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে। আমরা শুধু সহযোগিতা করব। নির্মলাকে বললেন, তোমার সন্তুষ্টির জন্য বিয়ের পর বড় করে একটা পার্টি দিয়ে দাও। সব বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ হোক। তোমার পূজা আর না দিলেও চলবে। কারণ এত বছরের আরাধনা কাজ হয়নি। যা হবার তাই হয়েছে। এদেশে দেবতারা খুব একটা নাক গলাতে আসেনা।

যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল একটা চার্চে। ব্রায়ানের ইচ্ছে অনুযায়ী। পিঙ্কির মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী আর একবার পুরোহিত ডেকে শুদ্ধ করা হল। এক সপ্তাহ পর পিঙ্কি ব্রায়ানের সাথে চলে গেল শিকাগো শহরে। যে শহর বাঙালির কাছে চিরঋনে ঋনী। যেখানে বাঙালী স্থপতি ফজলুর রহমান খানের সৃষ্টি চিরকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িযে আছে। তিনি সিয়ার্স টাওয়ার-এর ডিজাইন তৈরি করে অমর হয়ে আছেন সেখানে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম টাওয়ার। সেই টাওয়ারে তাঁকে অমর করে রাখার জন্য, শতবর্ষ পরেও পৃথিবীর মানুষ যাতে ভুলে না যায় সেই জন্য তাঁর একটা মুর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে। লেখা আছে, 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ স্থপতির স্বীকৃতি স্বরূপ'। তিনি শিকাগোতে এবং বিশ্বে অমর। সেই টাওয়ারে হয়ত কোনদিন পিঙ্কি যাবে, সেই মূর্তিও দেখবে। হয়ত জানবেনা এই এফ আর খান কে? জানবেনা এই এফ আর খান প্রাইমারি স্কুলে তার বাবার সহপাঠী ছিলেন।

-৫২-

এবারের সাহিত্য আসর ডঃ জাফর ইকবালের বাড়ী নিউ জার্সিতে। বাহারের গাড়ীতে ওরা চারজন রওয়ানা দিল সকাল নয়টায়। প্রায় দুঘন্টা লেগে গেল গিয়ে পৌঁছতে। গিয়ে দেখি আরও অনেকে আগেই এক দফা খাওয়া শেষ করে ফেলেছে। আসর এখনও শুরু হয়নি।

তিন বিঘা জায়গার উপর বিরাট বাংলো। বাড়ীর তিন দিকেই খোলা জায়গা, বাগান। বাগানে ফুল আর ফলের গাছ। নানা রকম ফুল আর ফল। ফলের ভারে গাছের ডালা নুইয়ে পড়েছে। একটা বড় ফুলের গাছের নীচে বারবিকিউ হচ্ছে। জাফর ইকবাল নিজেই তদারকী করছেন। তার সাহায্যকারি দুজন। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ঝোঁপ ঝাড়ে ভর্তি বাড়ীর চারদিক। আনিস তাকিয়ে দেখল সবুজের খেলা। কোন দিন সে খেয়াল করে দেখেনি সবুজের রং। সবুজ সবুজই সে জানে। কিন্তু এখন তাকিয়ে দেখল সবুজের কত রং! এক একটা গাছের পাতা এক এক রংএর সবুজ। সবুজ কত প্রকার! কোনটা গাঢ় সবুজ, কোনটা কম গাঢ়, কোনটা পাতলা সবুজের ছোয়া মাত্র। অনেক ক্ষন তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় কত প্রকার সবুজ, একই সবুজ রঙে। বাইরের তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রীর উপর। গরমে গাছের নীচে আসর জমবে না। তাই যার যার খাবার নিয়ে বিরাট লিভিং রুমে আসর শুরু হল।

আসর শুরু হল বেলা একটার দিকে। জাফর ইকবাল ঘরোয়া মাইকে ঘোষনা দিলেন আজ আসরে কে কি পড়বেন। লতা পড়বে তার নিজের লেখা একটা কবিতা। পড়া শেষ হয়ে গেলে লেখার উপর আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমেই শুরু হল কবিতা দিয়ে। তারপর একে একে প্রবন্ধ, গল্পআর কৌতুক চলল সারাদিন। লতার কবিতা বেশ হাত তালি পেল। ডঃ জাফর ইকবাল ঘোষনা দিলেন, আজকের আসরের শেষ হবে একটা গল্প দিয়ে। সে গল্পগল্প নয়। এখানকার এক পরিবারের জীবন্ত কাহিনী। জীবনকে নিয়েই সাহিত্য। গল্প সাহিত্যের অংশ। তাই এই গল্প জীবনের অংশ। আমরা যারা প্রবাসে আছি তাদের জীবনের গল্প। সুখ দুখের গল্প। গল্প লিখেছেন নবীন গল্পকার আনিসুর রহমান আনিস। তার প্রথম গল্প। তার প্রতিবেশীর জীবনে ঘটে যাওয়া জীবন্ত কাহিনী নিয়েই তার লেখা শুরু। গল্পের নাম 'ওপি ওয়ান'। এবার তিনি তার গল্প পাঠ করবেন। আনিস শুরু করল:

জিয়া বিমান বন্দরে ট্যাক্সি থামতেই ডজনখানেক ভিক্ষুক এসে ঘিরে দাঁড়াল। হেনা এক পা নীচে বাড়িয়েছে কিন্তু আর এক পা রাখার জায়গা নেই। সবাই হাত বাড়িয়ে বলছে, আপা একটা ডলার দেন, মা একটা ডলার দেন।" পেছন থেকে কয়েকটা বাচ্চা বলছে, "একটা পাউন্ড দেন, আবার কেউ বলছে একটা রিয়াল দেন"। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে কে আগে আসবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা। এখন আর ট্যাক্সির চারদিকে নয়, যেদিক দিয়ে হেনা নামছে সেদিকেই সব। ড্রাইভার এসে ধমক দিয়ে স্থান করে দিল। কিন্তু তাতে শুধু টেক্সি থেকে বের হবার জায়গাই হল, এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলনা। ব্যাগ দুটা নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার ভাড়া নিয়ে চলে গেল। তার কর্তব্য শেষ। তারপর যাত্রীর কর্তব্য কি হবে তা তার জানা আছে।

হেনা একবার চোখ বুলিয়ে দেখল। ছেলেমেয়ে, বুড়াবুড়ী মিলে প্রায় পনের বিশ জন। ভিক্ষার মান বদলে গেছে। কেউ বাংলাদেশী টাকা চায় না। বিদেশী মুদ্রা। বাংলাদেশী এক টাকা দিলে নাকি বিমান বন্দরের ভিক্ষুকরা নেয় না। তাদের সমিতির নিয়ম।

হেনার কাছে যা সামান্য ডলার আছে তা তার প্রয়োজন হবে। নিউইয়র্কে পৌঁছে যদি টেক্সিতে বাসায় যেতে হয়। তাই বাংলাদেশী টাকা যা আছে তাই দিয়ে সরে পড়বে ভাবছে ব্যাগে হাত নিতেই অনেক গুলো হাত এক সাথে এগিয়ে এল লিক লিক করে। আবার ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার। হেনার বেগে যা ছিল তা দিয়ে দেবার পর অনেকটা ফাঁকা হল।

একটা লোক এতক্ষন দূরে দাড়িয়েছিল। ফাঁকা হবার পর এগিয়ে এল। তার পরণে ছেড়া ময়লা লুঙ্গি পাঞ্জাবী। হেনা তার ব্যাগ দুটা উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। লোকটা এগিয়ে এসে ব্যাগ দু'টা হাতে নিয়ে বলল, চলেন আমি আগ্যাইয়া দিয়া আই।

হেনার মনে হল ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু দাবী করে বসবে। বলল, না, না লাগবেনা। আমি নিজেই নিতে পারব।

কিছু দেওন লাগবো না। কোন চিন্তা কইরেন না।

হেনার পেছন পেছন চলতে চলতে লোকটা জিজ্ঞেস করল, আফা নিউ ইয়র্ক যাইবেন বুঝি?

তুমি কি করে বুঝলে?

অখন যারা এয়ারপোর্টে আইব তারা সব নিউইয়র্ক যাইব এইগুলি আমার মুখস্থ অইয়া গেছে।

তুমি কি এয়ারপোর্টে কাজ কর?

না, কাজ করি না। তয় দুই বছর ধইরা নিউইয়র্কের প্লেইনডা ছাড়নের সময় একবার এয়ারপোর্টে আই। যদি কেউ আমার একটা উপকার করে।

হেনা মনে মনে ভাবল লোকটা বোধ হয় একটা ফন্দি আটছে। এখনই টাকা চাবে। তাকে দিয়ে ব্যাগ দু'টো আনানো ঠিক হয়নি। এ কথায় কান না দিয়ে তারা লাউঞ্জে গিয়ে পৌঁছল। ব্যাগ নামিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। হেনা দেখল কিছু না দিলে লোকটা যাবে না আর না দেয়াটাও অন্যায় হবে। তাই তার হাত ব্যাগ থেকে একটা ডলার বের করে লোকটা হাতে দিতে গেল।

লোকটা বলল, না, না, আমারে টেখা দিয়েন না, টেখা চাইনা। তার থেইক্যা আপনে আমারে একটা উপকার কইরা দেন। আমেরিকা থাইক্যা একটা লোক বাইর কইরা দেন। তইলেই আমার উপকার অইব।

হেনা তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, তার ঠিকানা জান?

না, তার ঠিকানা জানলে ত আমিই চিডি লেখতাম।

তাহলে কিভাবে খোঁজ করব ? লোকটা কি তোমার আত্নীয়?

না, আত্নীয় না। আমি চিনিও না। তয় নামডা জানি। আমার নাম।

তোমার নাম? সে আবার কি?

আপনের সময় থাকলে আমার দুঃখের কথাডা কই। হুনবেন?

হেনা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল কিছু সময় আছে। বলল, সংক্ষেপে বল, শুনি।

ওপি ওয়ানের লটারি পাইছিলাম। পাওনের লগে লগেই চাইরদিক খবর অইয়া গেল। কি খুশি আর হৈ চৈ! আমার থাইক্যা অন্য মানুষে বেশি খুশি। খালি দাওয়াত আর দাওয়াত। এক মাস পয্যন্ত খালি দাওয়াত খাইছি। ঘর থাইক্কা বাইর অইলেই মানুষ আমার দিকে চাইয়া থাকে। যারা কোনদিন আমার লগে কথা কইতনা তারাও যাইচা কথা কয়। মানুষের আচার ব্যবারে আমার কাছে মনে অইল আমি একটা বিরাট কিছু অইয়া গেছি।

খবর নিয়া জানলাম পুলামাইয়া বউ লইয়া যাইতে এক লাখের মত টেখা লাগে। এই টেখা দ আমার কাছে নাই। চাইর কানি ক্ষেত আছিল, আর বাড়ীডা। অনেকে বুদ্ধি দিল, বেইচ্চা দেও ক্ষেত আর বাড়ী। আমেরিকায় গেলে এমন কত বাড়ীঘর অইব। তখন তোমার দলানে ঘুমাইবার মানুষ পাইবা না। আবার কেউ বুদ্ধি দিল পুলামাইয়ার ভিসা বেইচ্চা দিতে। কেউ কইল সব এক সাথে যাইতে। হেই দেশে সবাই

কাজ করতে পারে। কাজ না পাইলে আমেরিকার সরকার সাহায্য করে।

আমাদের চেয়ারম্যান আইল পঞ্চাশ হাজার টেখা লইয়া। তার ছেলেডারে আমার ছেলে কইয়া লইয়া যাওনের বুদ্ধি দিল। চিন্তা করলাম আমার ছেলে থুইয়া আর একজনের ছেলে লইয়া যামু। থাক ঐসবের দরকার নাই। বেইচ্চা দিলাম বাড়ীঘর আর জমি। আমার শালা কাশেম কইল, যদ্দিন দরকার তদ্দিন আমার বাড়ীতে থাকেন। আমেরিকা যাওয়ার আগ পয্যন্ত আমার বাড়ীতেই থাকবেন খাইবেন । কোন অসুবিধা অইব না। বাড়ী বেইচ্চা চইলা গেলাম কাশেমের বাড়ী।

এক মাস যাইতে না যাইতেই কাশেমের বউএর লগে আমার বউ লাইগা গেল। আগেও বেশি বনি বন্তা আছিল না। এখন দ আমার বউ আমেরিকান। কথা শুনব কেন? আলাদা খাওয়া শুরু করলাম।

ছয় মাস চইলা গেল। এমবেসির চিঠি আর আসেনা। কয়েক জনের বুদ্ধিতে আর একটা দরখাস্ত দিলাম। তারও উত্তর আসেনা। শেষমেষ এমবেসিতে গেলাম । দুইদিন ঘুইরা কথা কওনের সুযোগ পাইলাম। আমার চিঠিডা নিয়া একজন ভিতরে গেল। কতক্ষন পর ফিরা আইয়া কইল - এই লোক তো চইলা গেছে।

চইলা গেছে? কি কন? এই লোক চইলা গেছে! এই লোক দ আমি! চইলা গেলে আমি আপনের সামনে দাড়াই রইলাম কেমনে? ভালা কইরা দেখেন।

লোকটা কইল, ভালা কইরাই দেখছি। এখন করার কিছু নাই। একটা দরখাস্ত দিতে পারেন।

আমার মনে অইল আমার উপর গজব আইয়া পড়ছে। বাড়ী ফিরা আইতে ইচ্ছা অইল না। তখন শুনলাম আমার মত অনেকের লটারি বেচা অইয়া গেছে। তারা সবাই মিলা একটা ব্যবস্থা করব। ঘুরাঘুরি কইরা এক সপ্তা পরে ফিরা আইলাম কাশেমের বাড়ী। এখন আমার বাড়ী নাই, জমি নাই, লটারিও নাই। এই দশএগার মাসে অনেক টেখা ভাংগা অইয়া গেছে। তখনও বাড়ীডা রাখা যাইত। কিন্তু যে লোক বাড়ী রাখছে সে থাকে সৌদি আরব। আর এদিগে ওপি ওয়ান সমিতিও কইল একটা ব্যবস্থা অইব।

তখন থাইক্কা শুরু অইল ঢাকা আসাযাওয়া। প্রতি মাসে দুই তিনবার। আসলেই দুইতিনশ টেখা খরচ অয়। কদম আলীর লটারিও বেচা অইয়া গেছে । তার বাড়ী মহাখালি। সেই বুদ্বি দিল। "এইভাবে টেখা খরচ না কইরা এইখানেই থাক। মাইয়াপুলা নিয়া চইলা আস। আমার বাড়ীতে একটা ঘর আছে।
ভাড়া যা দেও দিও। সমিতি যখন ধরছে একটা ব্যবস্থা অইবই।"

এদিগে কি কইরা যে গেরামের মানুষ জাইনা গেছে আমার লটারি বেচা অইয়া গেছে। আমেরিকায় যাইতে পারমু না। ঘর থাইক্কা বাইর অইলেই হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে অয়। আগে মানুষ একটা সম্মান দিয়া কথা কইত, এখন দয়া কইরা কথা কয়। খালি আপসোস করে। এখন কি অইব, কি কইরা চলন এইসব হাজার কথার উত্তর দিতে অয়। আর কাশেমের বউএর কথাবার্তাও অসহ্য অইয়া গেল। কথায় কথায় কয়, সারা জীবনের লাইগ্যা দ বাড়ী দিয়া দেই নাই। আর কদিন থাকবা?

একদিন সব নিয়া চইলা আইলাম কদম আলীর বাড়ীত।

আগে গরু রাখত ঘরটায়। পরিস্কার কইরা উঠলাম এইখানে, আর ডেইলি সমিতির কাছে যাই। আজকাল করতে করতে চইলা গেল ৭/৮ মাস। ভাড়া দিতাম তিরিশ টেখা। আমরা চাইরজনের খরচ, এইভাবে

টেখা প্রায় শেষ। বছরখানেক পরে টেখা শেষ অইয়া গেল। কদম আলীকেও ভাড়া দিতে পারি না। সমিতিও কইয়া দিল লটারি আর অইব না। তারপর কদম আলী ছয়মাস ভাড়া ছাড়াই থাকতে দিল। টুকটাক কাজ যেখানে যা পাই করি। শেষমেষ আইয়া উঠলাম রেল লাইনের পাশে। ছালা দিয়া খুপরি বানাইয়া থাকি।

দুই বছরে আমি ফকির অইয়া গেলাম। কত আশা ছিল। পোলামাইয়াডারে লেখাপড়া করামু, আমেরিকায় যামু, ডলার কামামু, সুখে থাকমু। আমার সব শেষ। পোলাডা এখন মহাখালি বাজারে মিস্তিগিরি করে, বউডা বাসায় কাজ করে। মাইয়াডা বড় অইতাছে। কি যে পাপ করছিলমি জানি না ! আপনে এই লোকটারে একবার খুইজ্যা বাইর করবেন, এই আমার অনুরোধ।

সে লোককে পেলে কি করবে ? হেনা জিজ্ঞেস করল।

একটা কথা কওনের লাইগা। জিগানের লাইগা যে, তোমরা যে তার লটারি নিয়া চইলা আইলা, সে পরিবারটা এখন রাস্তার ভিক্ষুক।

হেনা বলল, যারা কিনেছে তাদের তো দোষ দেয়া যায় না। তারা জানেনা কার লটারি, দোষ তাদের, যারা বিক্রি করেছে।

দোষের কথা কইনা। আমার কথাডা অইল, চইলা যখন গেছে করার কিছু নাই। কিন্তু তারা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। বাংলাদেশ থাইক্কা লোক নিতে পারে, এক মাসের টেখা পাঠাইলে অনেক। তারা যেন একটু দয়া করে - এই কথাডা কওনের লাইগা। এর লাইগাই আমি এয়ারপোর্টে আই। এই দুই বছরে কত লোকের কাছে ঠিকানা দিলাম, কোন খোজই পাইলাম না এখন পয্যন্ত!

হঠাৎ মাইকে ঘোষনা হল, আমেরিকার যাত্রীদের চেক ইন হচ্ছে। হেনা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং কাউন্টারের দিকে রওয়ানা দিল।

লোকটা তাড়াতাড়ি করে তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে হেনার হাতে দিয়ে বলল, এই চিঠিডা নিয়া যান। আমার আর দরকার নাই। আপনে এই নামের লোকটারে পান কিনা দেখেন। সারাজীবন আপনার কাছে ঋনী অইয়া থাকুম। এই চিঠিতেই আমার নাম ঠিকানা লেখা আছে। মাসে একবার গিয়া খোঁজ নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বে হেনা চিঠিটা হাতে নিয়ে ব্যাগে রাখল।

আকাশপথে দীর্ঘ যাত্রা। খেয়ে ঘুমিয়েও সময় কাটেনা। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ টিভি দেখল। হঠাৎ লোকটার চিঠির কথা মনে হল। সময় কাটানোর জন্য ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে ভাজ খুলতেই চার টুকরা খুলে পড়ে গেল। কাগজটা ভাজে ভাজে খেয়ে একবারে তুলোর মত প্রায়। কুড়িয়ে একসাথে করল। আমেরিকান দূতাবাসের চিঠি। ঠিকানা লেখা আছে : বদিউল আলম, গ্রাম - সৈয়দাবাদ, ...নাম ঠিকানা দেখেই হেনা আৎকে উঠল। এযে তার খুব পরিচিত নাম ঠিকানা! মানুষটাকে কোনদিন চোখে দেখেনি। এই সেই বদিউল আলম! আর এই বদিউল আলমের এই অবস্থা! তাকে একটা পয়সাও দিয়ে আসলাম না! একটু ভাল কথাও বললাম না! অথচ ... মুহূর্তে হেনার মনটা বিষিয়ে গেল। জীবনের প্রতি, নিজের আরাম আয়েসের প্রতি একটা ধিক্কার এসে গেল। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ভারাক্রান্ত মনে এক সময় কেনেডী এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। ইমিগ্র্যাশান কাউন্টার থেকেই দেখা গেল তার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে। হেনার মনে হল এ তার স্বামী নয় - আলম দাঁড়িয়ে আছে। সাথে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন তার ছেলেমেয়ে নয় - আলমের । দুলাল আর জমিলা।

হেনার চেহারা দেখে তার স্বামী জহির ভয় পেয়ে গেল। হেনা তার অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিল। জহির ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই খবর ভাল নয়, তার মা বোধ হয় নেই। পথে গাড়ীতে বসে ভয়ে ভয়ে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে হা অথবা না উত্তর পেল। ঘরে এসেই হেনা সোজা তার বেড রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে হল এই বিছানা খাট সব যেন আলমের ডলারে কেনা। এসব যেন আলমেরই থাকার কথা ছিল!

এক সময় জহির তার পাশে গিয়ে বসল। মাথায় হাত রেখে "কি হয়েছে" জিজ্ঞেস করতেই হেনা তার ব্যাগ থেকে সেই ছিন্ন মলিন আশ উঠা চিঠিখানা বের করে জহিরের হাতে দিল। "দেখ তো তোমার পাসপোর্টের সাথে এই নাম ঠিকানা মিলে কিনা" বলে বালিশে মুখ গুজে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

গল্প শেষ হল। সকলেই বাহাবা দিল। আনিসের জীবনের প্রথম গল্প। সকলেই প্রশংসা করল। ড: জাফর ইকবাল বললেন, তুমি লেখা চালিয়ে যাও। অনেক ভাল করবে। অদ্ভুত সুন্দর গল্প হয়েছে।

আনিসের উৎসাহ বেড়ে গেল। লতার চোখগুলো চিক চিক করে উঠল।

-৫৩-

পিঙ্কির বিয়ে হয়ে যাবার পর নিউইয়র্কের বাতাসটা মনে হয় বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। চার্চ এভিনিউ থেকে ওজন পার্ক বেশ দূর। লতা যখন তখন যেতে পারে না। সাবওয়েতে গেলে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে যায়। তাই বেশি সময় এখন ফোনে আলাপ হয়। সপ্তাহে দু'তিন দিন লতা বিন্দুর কাছে যাবেই। আর বিন্দু বরফ গলানোর কাজটা করে যাচ্ছে। বরফ গলানোর ব্যাপারে বিন্দুর অনেক কেরামতি আছে। অনেক দিন থেকেই লতাকে অনেক কথা বলে আসছে। আনিসের গুনগান। আনিসের মত এমন ছেলে হয়না! তার জীবনে কোনদিন কোন ক্লাশে দ্বিতীয় হয় নাই। সককিছুতে সে প্রথম। এখানেও সে ভাল লেখাপড়া করছে। সককিছুতেই সে এ গ্রেড পাচ্ছে। পিঙ্কি একটা গোয়ার, বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে কোন হিসেব করে না। কে কি বলবে তা সে চিন্তা করে না। তার সব বন্ধুদের সাথেই সে কোলাকোলি করে, চুমো দেয়। এখানে আনিসের করার কিছুই ছিল না। আনিস এমন স্বভাবের ছেলেই নয়। এতদিন এসব কথা খুব একটা কাজে লাগেনি। যখন পিঙ্কির বিয়ে হয়ে গেল এবং আনিস দাওয়াতও পেল না তখন বিন্দু পরিবেশটা একবারে হাল্কা করে দিল। লতা এবং আনিসকে নিয়ে একদিন বসল তার বাসায়। অনেক গল্প আর গান শোনার পর বাতাসটা বেশ হাল্কা মনে হল। বোঝা গেল বরফ গলেছে।

বিন্দুর রাগ ঐ দাঁড়িওয়ালাটার উপর। এই কয় মাসে সে পুলিশের চাকরিটা করতে গিয়ে দেখেছে দুজনেই মরমে মরছে। লতা সব সময় আনিসকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। অথচ নিজেই জ্বলে মরছে। বিন্দু ভাবল, অন্তত তাদের বন্ধুত্বটা বজায় থাকুক। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাক। অনেক গল্পের পর লতা অনেকটা স্বাভাবিক হল। সন্ধ্যার পর লতা বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল। এক সাথেই সাবওয়েতে এসে বসল দুজন। সাবওয়ে থেকে নেমে আনিস বলল, চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব আমার বাসায়।

শান্ত আনিসের হাত ধরে আছে। পথে যেতে যেতে আনিস জিজ্ঞেস করল, শুনলাম এই কয় মাসে বই কিনে নাকি একটা লাইব্রেরী করে ফেলেছেন?

বেশি কিনিনি। মাত্র শ দুয়েক। এ দিয়ে কি লাইব্রেরী হয়?

বাসার সামনে এসে আনিস বলল, আচ্ছা চলি।

চা না খেয়ে যাবে না। চল, ভেতরে চল। যেন একটা আদেশ।

আদেশ শিরোধার্য করে বাধ্য ছেলের মত আনিস ঘরে গলে।

বাহারের ঘরে অনেক কিছুই খাওয়া হয়েছে। তারপরও লতা টেবিলে এনে অনেক কিছু রাখল। তারপর চা নিয়ে এসে বসল। বলল, তোমার সেই গল্পটা অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে। প্রশংসা পাবার যোগ্যতা রাখে। এমন একটা সুন্দর গল্পের জন্য তোমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত। একটু দেরীতে হলেও ধন্যবাদ দিলাম।

সেদিন চোখের দিকে তাকিয়েই আমি ধন্যবাদ পেয়ে গেছি।

তাই নাকি? তোমার চোখ এত শার্প?

ঠিক এ সময় সৈয়দ সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। ডাইনিং টেবিলে আনিসকে দেখে তিনি হঠাৎ থমকে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত। আরে আনিস! তোমাকে তো দেখাই যায় না! কেমন আছ?

ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

ভাল। চাচা কেমন আছেন? ওনার সাথেও অনেক দিন কথা হয় না। দেখাও হয় না।

আজকাল উনি খুব একটা বের হন না। শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছেনা। বয়স হয়ে গেছে। কাজকর্ম তো ছাড়তে চায় না। আমিই জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছ। জীবনে তো অনেক কষ্টের কাজ করেছেন। আর কত? তোমরা কথা বল, আমি কাপড় ছেড়ে আসি বলে তিনি চলে গেলে অন্য রুমে।

কথা বলতে বলতে কখন যে সাড়ে নয়টা বেজে গেছে ওরা খেয়াল করেনি। সৈয়দের চেহারা দেখে আনিস বুঝতে পারল আনিসকে এখানে দেখে সৈয়দ খুশি নয়। রাত হয়েছে, চলি বলে আনিস বেরিয়ে পড়ল। বাঙালি গ্রোসারী থেকে মসলা নিতে হবে।

আনিস বেরিয়ে যেতেই সৈয়দ সাহেব লতাকে জিজ্ঞেস করল, আনিস এ সময় কেন এসেছিল?

এমনি এসেছিল। বিন্দু আপার ওখানে দেখা। বললাম, চা খেয়ে যেতে। তাই এসেছিল।

তোমাকে তো আগেও বলেছি। ঐ বিন্দু আপার কাছে এত ঘন ঘন যাবার দরকার নেই!

কেন, বিন্দু আপার ওখানে গেলে কি হয়। আমি যাই শান্তর জন্য। ওখানে গেলে শান্ত খুব খুশি থাকে। ওরা সবাই শান্তকে খুব আদর করে। আমিও মনের মত একজন মানুষ পেযেছি যার সাথে দুটো কথা বলে শান্তি পাই।

ওখানে যাবার প্রয়োজন নেই। দরকার মনে করলে তুমি ওকে নিয়ে মাঠে যাবে। এর বেশি নয়।

সবাই তো ছেলে মেয়েকে নিয়ে আনন্দ করে, এখানে সেখানে যায়। তোমার তো সময় নেই। ছেলেকে মানুষ করতে হবে। তার মনের খোরাক দিতে হবে। শুধু ঘর আর স্কুলের গন্ডীর মাঝে থাকলে সে কিছুই শিখবে না। মানুষ হবে না।

দেখ, এসব নিয়ে তর্ক করবে না। আল্লহই মানুষ করবে। সব আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও।

তাহলে সবকিছুই আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তোমার ব্যবসাও। আমাদের সাথে একটু সময় দাও। অন্তত সপ্তাহে দু একদিন। তুমি ভুলে গেছ আমরা দুটা প্রাণী ঘর বন্দী। তোমার টাকার নেশা। এর বাইরে কোন চিন্তা কর না। আল্লাহর উপর যদি এতই ভরসা তাহলে দেশ ছেড়ে এখানে কেন এসছ? সেখানে কি আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকা যায় না?

তুমি আজকাল খুব তর্ক শিখে গেছ! কোথা থেকে এসব তর্ক শিখলে?

কেউ শিখায় না। পরিস্থিতি শিখায়। ঘরে একবার ফোন করারও তোমার সময় নেই। আমার কোন পরিচিত মানুষ নেই যেখানে দুটা কথা বলা যায়। বড় বোনের মত একজনকে পেয়েছি সেখানেও তুমি যেতে বারণ কর। তাহলে আমার সময়টা কাটবে কি করে?

শান্ত আছে। তার লেখাপড়া দেখ। এখানে যেসব মহিলা আসে তাদের সাথেও তো তুমি ভাব করতে পার। তাদের সাথে বাসায় বসে গল্প করতে পার। দরকার হলে তুমি কেনা কাটা করতে যে কোন মার্কেটে যেতে পার। টাকার কথা চিন্তা করোনা। তোমার যা ইচ্ছা খরচ কর। তোমার যখন দরকার আমাকে বলো, আমি ড্রাইভার পাঠিয়ে দেব।

টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না! ড্রাইভার ড্রাইভারের কাজ করবে। তোমার কাজ করতে পারবে না! তুমি সুখ পাও টাকা রোজগার করে, কেউ পায় টাকা খরচ করে। আমি এর কোনটাতেই সুখ পাই না। আমি চাই আর পাঁচজনের মত একটা সাধারণ জীবন। তোমাকে আগেও কতবার বলেছি। তুমি কান দাও না।

এখানে সাধারণের বাইরে কি হল?

তোমার কাছে যা সাধারণ আমার কাছে নাও হতে পারে। এই কয় বছরে তুমি নিয়ে গেছ কোথায়ও? কোন অনুষ্ঠানে বা কোন ঐতিহাসিক স্থানে? যদিও মাঝে মাঝে একটু সময় পাও তোমাদের জলসা নিয়ে বসে পড়। এই জলসার বাইরে তুমি আর কিছু দেখতে পাও না।

এটা এমন কিছু নয়। এই যে আশরাফ সাহেব। তিনি তো আমার আগে এসেছেন এ দেশে। তিনি ও তো কোনদিন ষ্ট্যাচু অব লিবার্টিতে যান নাই। এসব দেখার মত এমন কিছু নয়।

আশরাফ সাহেবের কথা বলবে না! এই লোকটার সাথে পরিচয়ের পরই তুমি আরও বদলে গেছ। তার কথা ছাড়া তুমি কিছুই কর না।

আশরাফ সাহেব সম্মন্ধে বাজে কথা বলবে না! ওনি একজন আলেম লোক!

তুমি তোমার আলেম নিয়ে থাক। আমাকে আমার ভাবে থাকতে দাও। এই ছক বাধা জীবনের ভেতর।

-৫৪-

গ্রোসারীতে গিয়ে নিখিলের সাথে দেখা। নিয়ে গেল ময়ুর রেষ্টুরেন্টে। সেখানে আরও অনেক মহা নেতা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছে। যারা একবার বসেছে এই তর্কে তারা সহজে উঠতে পারছে না।

আনিসের এসব তর্ক ভাল লাগে না। এক ফাঁকে উঠে পড়ল।

রাত বারটা। আনিস ঘুমাতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কলিং বেল বেজে উঠল। মেসে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। আনিস দরজার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হু ইজ ইট?

আমি শরাফত। ভাতিজা দরজা খোল। একটু কতা আছে। খুব দরখার।

আনিস দরজা খুলতেই শরাফত চাচা ঘরে ঢুকে দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিল। তারপর আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, অখন কি করতাম ভাতিজা? পুলাডা তো ঘরে আয় নাই, পুড়িডা আর একটা পোলা লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ কইরা রাখছে। আমি দ পাগল অইয়া গেলাম ভাতিজা! অখন আমি কি করতাম কও!

শরাফতের একটু কাহিনী আছে। তিনি এসেছেন ১৯৯০ সালে প্রথম ওপি ওয়ান ভিসায়। পল্লীগ্রামের সরল সোজা মানুষ। কৃষিকাজ করা, গ্রামের বাজারে বেচাকেনা করা, অবসরে মসজিদে সময় কাটানো, ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয়া, পাঁচ ওয়াক্ত গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়া তার নিত্য কর্ম। তিনি রাজনীতি বুঝেন না। ভোটের সময় ইমাম সাব যার কথা বলেন তিনি তাকেই ভোট দেন। প্রতি দিন প্রতি জামাতে তার তের বছরের ছেলে সফিককে সাথে নিয়ে যান। সফিক খুব অমায়িক ছেলে। কোরান খতম করেছে আট বছর বয়সে। এখন স্কুলে পড়ে ষষ্ঠ শ্রেনীতে। খুব ভাল ছাত্র। স্কুলে তার অনেক নাম। মসজিদের ঈমাম সাব খুব আদর করেন। মাঝে মাঝে ইমাম সাবের ঘরের কাজ কর্ম করে দেয়। ইমাম সাবের বাড়ী অন্য জেলায়। তাই এখানে মসজিদের পাশের বাড়ীর বাইরের ঘরে তিনি একা থাকেন। মাঝে মাঝে সফিকও থেকে যায়। শরাফতের একটি মেয়ে বার বছরের। সপ্তম শ্রেনীতে পড়ে।

গ্রামের অনেকেই বিদেশে থাকে। শরাফতের কোন বড় ছেলে নাই যে পাঠাবে। নিজে বিদেশে যাবে সে চিন্তাও করতে পারে না। যখন ওপি ওয়ানের লটারির খবর পাওয়া গেল তখন গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সফিক এসে বলল, দরখাস্ত একটা করত হবে। পাইলে তো ভাগ্য খুলে গেল। আমরা সবাই চলে যাব। শরাফত আরও জানতে পারল যে, এটা সরকারি লটারি। কোন কোম্পানি না। আমেরিকান সরকারই সব ব্যবস্থা করছে। যারা লটারি পাবে তাদের গ্রীন কার্ড থেকে যা দরকার সব দিবে। তাদের ছেলেমেয়েদের ফ্রি লেখাপড়া করাবে ইত্যাদি অনেকের মুখে অনেক রকমের কাহিনী। এত সব সুবিধার লোভে তিন শ টাকা খরচ করে একটা দরখাস্ত করে দিল। দরখাস্ত করে তিনি মসজিদে গিয়ে ঈমাম সাহেব সহ খাস দিলে দোয়া করলেন, আল্লাহ যেন তার এবং তার ছেলেমেয়ের মকসুদ পুরা করে।

আল্লাহ খাস দিলের খাস দোয়া কবুল করলেন। শরাফত লটারি পেয়ে গেল। চারদিকে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। একই কথা, আমেরিকার সরকার তাদেরকে নিচ্ছে। সব দায়ীত্ব আমেরিকান সরকারের। যখন শুনল যে টিকেট নিজের পয়সায় কিনতে হবে তখন তিনি হতাশ হয়ে গেলেন। যাক কোন রকমে টিকেটটা নিয়ে পৌছতে পারলেই আর চিন্তা নাই। তাই তিনি জমি জমা বিক্রি করে এই চারজনের টিকেটের টাকা জোগাড় করে একদিন আমেরিকার এই স্বপ্ন নগরে এসে পৌছলেন।

যত সহজে বললাম তিনি তত সহজে এসে পৌঁছতে পারেননি। জীবনের মূলকে এত সহজে উৎপাটিত করা যায় না। এক দিকে দূরের হাতছানি, উন্নত, সুখী জীবনের স্বপ্ন, সন্তানের স্বপ্নময় ভবিষ্যত গড়ে তোলা, আর এক দিকে তার নিজের শেকড় চারদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে এই মাটির সাথে মিশে আছে যে কিছুতেই আলাদা করা সহজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা যারা বিদেশে আছে তাদের কত টাকা পয়সা, কত লেখাপড়া - এসবই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই পরবাসে। নিজের

বাড়ীঘর, জমি জমা তার ভাতিজার হাতে সপে দিতে যথেষ্ট সময় লাগল। তিনি ভাবলেন যে কোন সময় তো ফিরে আসা যাবে। এই প্রবোধ দিলেন নিজকে। তার পরিচিত যারা নিউইয়র্কে আছে তাদের ঠিকানা যোগাড় করলেন। তার গ্রামের সুলেমান থাকে নিউইয়র্কে। সুলেমানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের থাকার ব্যবস্থা কিভাবে হবে জানতে চাইলেন। সোলেমান বলল, অস্থায়ীভাবে আমি একটা ব্যবস্থা করব। আপনারা আসার পর নিজেদের ব্যবস্থা করে নিবেন।

শরাফত বলল, হেইডা তো সরকারের মাথা ব্যথা। আমরার কিছু করতে অইবনা। আগে যাই, পরে দেখা যাইব কি করতে অইব।

চোখের জল গোপন করে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে, জীবনের জীর্ন পুরাতন সব ফেলে এসে পৌঁছলেন সোলেমানের এখানে। পরে সোলেমানের সাহায্যে তার কাছাকাছি একটা তিন বেডরুমের বাড়ী নিলেন। সাথে বেশি টাকা পয়সা আনেনি। কারন সরকার সব ব্যবস্থা করবে।

সোলেমান যখন বলল, চাচা, একটা কাজ দেখেন। না হলে সংসার চলবে কি করে?

শরাফত আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, ইডা কি কও? কাম করতে অইবনি? এই কতা আছিল না দ? সরকার তাইলে মিছা কতা কয়নি? তাইলে দ আইতামনা। অত টেখা খরচ কইরা আইয়া লাভ অইল কি? অখন আমি কি কাম করতাম? আমারে কেডা কাম দিব?

সোলেমান বুদ্ধি দিল অন্য কাজ না পেলে কনষ্ট্রাকশনে কাজ পাওয়া যাবে। যদি রাজি থাকেন তাহলে আমি বলে দিব। আমাদের অনেক কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী জানাশোনা আছে।

আর কোন ব্যবস্থা নাই নি?

আছে। আপনি তো ইমিগ্রেশন নিয়ে এসেছেন। সরকারের ওয়েলফেয়ার বিভাগ আছে। সেখানে দরখাস্ত করলে সাহায্য পাবেন। তাদেরকে বলতে হবে আপনার অসুবিধার কথা। তারপর ওয়েলফেয়ার বিভাগ থেকে এক মাসের মধ্যেই শরাফতের আশা পূরণ হয়ে গেল। সরকার এনেছে, অতএব সরকারের দায়িত্ব সব ব্যবস্থা করা। শরাফত ঘরভাড়া পায়, খাওয়ার জন্য ফুড ষ্ট্যাম্প পায়। মাথাপিছু আড়াইশ ডলারের সমপরিমাণ। এই ফুড ষ্ট্যাম্প যে কোন গ্রোসারীতে খুশি হয়ে গ্রহণ করে ডলার হিসেবে। আর কোন চিন্তা নাই। খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। সময় মত নামাজ পড়ে। যখন তখন চার্চ এভিনিউতে ঘুরে বেড়ায়।

বাসা নিয়েছে আনিসের বাসা থেকে দু ব্লক উত্তরে। গ্রোসারীতে আনিসের সাথে আলাপ। চাচা নতুন মানুষ দেখলেই আলাপ করেন। দেশের কথা জানতে চান। অখন কোন কাল বাংলাদেশে? বইস্যাকাল? আহারে ধানের যে কি অবস্থা কে জানে। উত্তরের বিলডা বুঝি অখন ভইরা গেছে পানিতে। ধান না ডুবলেই অইল। বিলডার পানি আবার তাড়াতাড়ি সরতে পারে না। পাহাইরা পানি আতকা আই ভইরা যায়। পানি সরতে সরতে ফসল নষ্ট অইয়া যায়। এসব অনেক চিন্তা নিয়ে অনেক আলাপ করেন। আনিসের খুব ভাল লাগে এই সরল সোজা মানুষটাকে। যখন তখন দেখা হয়। মাঝে মাঝে আনিসের ঘরে আসে। অনেক গল্প হয়। চাচা মনের মত একজন মানুষ পেয়েছে। মনের কথা খুলে বলে।

পোলাপানগুলি কথা শুনে না। এইখানে আইলাম পোলাপানের লেখাপড়ার জন্য। সব লেখাপড়া শেষ কইরা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তর অইবার

লাইগা। অখন লেখা পড়া করতে দেখি না। মাষ্টররা জানি কেমুন। কিছু জিগায় না। না পড়লে কোন শাস্তি দেয় না। এ কেমুন দেশে আইলাম। মনে করছিলাম এই দেশে ভাল লেখা পড়া হয়। এখন দেখছি কোন লেখাপড়াই নাই। স্কুলে যায় আর আসে। আর পোলাপুড়ি এক সাথে থাকে। স্কুলের পরে পুড়িডা একটা পোলা নিয়া কোথায় ঘুরতে যায়। ফিরে অনেক দেরি কইরা। জিগাইলে কয় লাইবেরীতে গেছিল। সফিকটাও এই কথা কয়। এই দেশে থাকলে নাকি পোলা মাইয়া এক সাথে থাকতে অয়। আমার একদম সহ্য অয়না। যখন দেখি আমার মাইয়াডা আর একটা পোলার সাথে গলাগলি করে তখন আমার মাথাডা ঠিক রাখতে পারি না। জিগাইলে কয় আমরা এখন আঠার হয়ে গেছি। আমরা নিজেরা ঠিক করব কিভাবে চলব। হুন কথা! আঠার অইলেই বুঝি আর মা বাপের কাম লাগেনা? তাইলে আমরা থাইক্কা লাভ কি? সফিকটা হেইদিন একটা পুরি লইয়া ঘরে আইছে। নিজের ঘরে সারাদিন আছিল। স্কুলে যায় নাই। পুরি চইলা গেছে পর জিগাইলাম। কইল কাজ আছিল। স্কুলের কাজ। এমনি অনেক দুঃখের কথা বলে আনিসের সাথে।

একদিন এসে বলল, তার মেয়ে ফাতেমা অনেক রাতে ঘরে ফিরেছে। একটা গাড়ীতে করে এক ছেলে নামিয়ে দিয়ে গেছে। সে নাকি তার বন্ধু।

আনিস এসব শুনে আর সান্ত্বনা দেয়। এটা আমেরিকা। এখানে শিক্ষক পড়ায়। ছাত্র যদি না শিখতে চায় তাহলে শিক্ষকের করার কিছু নেই। এদেশে জালি বেত নেই। কোন ধমক নেই, কোন বেত্রাঘাত নেই। বেত্রাঘাত করলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যাবে। শিক্ষক চাকরি হারাবেন। ছেলেমেয়েকে তাদের নিজের ভাবে চলতে দিন। আপনার পুরনো মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। পুরনো ধ্যান ধারণা বদলাতে হবে। এদেশের স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ছেলেমেয়েদের কথা তারাই ভাববে। তারা এদেশের স্রোতের সাথে কিভাবে মিশে যাবে তা তারাই শিখবে। তারাই নিজেদের ভবিষ্যত নির্ধারন করবে। আপনি বললে তারা না শুনলে আপনার করার কিছু নেই। আপনাকে এসব ব্যাপারে দেখেও না দেখার ভান করতে হবে।

আরে বাবা, এইখানে আইয়া ত ধর্মকর্মও গেল। কেউ নামাজ পড়েনা। এই সফিকটা এক অক্ত নামাজ কাজা করত না। অখন তারে নামাজে নিতেই পারিনা। বলে কি, এসব নামাজ রোজা নাকি মানুষের হুকুমে শুরু হইছে। আল্লার হুকুমে না। দেখ ত কেমন নাফরমানি কতা! এই গুলি কি সহ্য করা যায়? কাফেরের কতা!

এসব সহ্য করতে হবে চাচা। যার যার ধর্ম তার তার হাতে। আপনার ছেলেমেয়ে হলে কি হবে, তাদের মতামতের বিরুদ্ধে আপনার বলার অধিকার নেই। তাদের ধর্ম তাদের পালন করতে দিন। আপনারটা আপনি করুন। এমনি ভাবে শরাফতকে আনিস প্রবোধ দিয়ে দিয়ে শান্ত রেখেছে।

আজ এত রাতে চাচার অবস্থা দেখে আনিস বুঝতে পারল তিনি অপ্রকৃতস্থ। মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে তা সহ্য করতে পারছেনা।

শরাফত বলল, পুরিডারে কইলাম তর পছন্দ অইলে বিয়া কইরা ফেল। বলে কি জান, বলে এই দেশে বিয়া করে না এই বয়সে। পোলাডাও একই কথা কয়। অখন কও, আমি কি করতাম? আমার

সামনে পুরিডা একটা বাইরের ছেলে লইয়া ঘুমাইব কি কইরা সহ্য করি! দরজা ভাইঙ্গা দুইডারে মাইর দিতে চাইছলাম। তোমার চাচী কইল আগে আনিসের লগে মাত গিয়া। তারপর যা করণের কইর। দরজা ভাইঙ্গা পোলাডারে একটা মাইর দিলে কি অইব কও!

মাইর দিলে পুলিশ আসবে, আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনার মেয়ে আপনার পক্ষে কথা না বললে আপনি বিপদে পড়বেন। কারণ মেয়ে এখন সাবালিকা। এদেশে সাবালক হলেই তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারবে। যদি সে কাজ কাউকে ক্ষতি না করে। মেয়ে তার নিজের ইচ্ছায় ছেলে নিয়ে ঘরে আছে। আপনাকে কোন বিরক্ত করছেনা। কাজেই পুলিশ এসে মেয়েকে কিছুই বলতে পারবেনা। পুলিশ কাজ করে আইন অনুযায়ী। আইনের বাইরে কিছু করলে পুলিশ বিপদে পড়বে। এখন আপনার এক মাত্র পথ হচ্ছে মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কথায় আনা। যাতে এ ধরণের কাজ না করে। ভাল করে বুঝিয়ে দেখুন। যদি রাজি থাকে তাহলে বিয়ে দিয়ে দিন।

এইডা দ বাবা সাদা পোলা। বনিবনা অইবনা। তারপরও মাইয়াডারে কইছি বিয়া করনের লাইগ্যা। কইছি আমার একটা ইজ্জত আছে সমাজে। এসব কাম কইর না মা। মাইয়াডা কয় কি জান? কয় এইডা তোমার বাংলাদেশ না। আমি আমারটা বুঝি।

আমার মনে হয় আগে সফিককে হাত করুন। তাকে দিয়ে মেয়েকে বুঝান।

সফিকের কতা কও? ওইডাই তো বড় শয়তান। বাংলাদেশে মাইয়াপোলা কানে দুল পড়ে। সফিকটা কান ছেদা করছে, দুই কানে দুই রকমের দুল পড়ে। গলায় মাইয়াপোলার মত হার পড়ে। এইডার লগে তো কতাই কওন যায়না। বেশি কিছু কইলে রাইতে ঘরে ফিরেনা। এই দেশের সরকার কি কোন রকম সাহায্য করেনা? পোলাপান এমন ভাবে নষ্ট অইয়া যাইব আর আমরা কিছু করতে পারবনা আবার সরকারও কিছু করব না। তয় পোলাপান মানুষ অইব কেমনে?

চাচা, যারা মানুষ হবার তারা হচ্ছে। যারা খারাপ হবার তারা খারাপই হবে। এদেশে সবই আছে। সবচেয়ে ভাল জিনিষ, আবার সবচেয়ে খারাপ জিনিষ। নির্ভর করে কে কোন্‌টা বেছে নিবে। তার কর্মের উপর নির্ভর করে তার ফলাফল। সেখানে মাতাপিতা ও কিছু করতে পারেনা, সরকারও কিছু করতে পারে না। কারন অধিকার রক্ষার জন্য সরকারই আইন তৈরি করে রেখেছে। এ ব্যাপারে আমিও কোন সাহায্য করতে পারবনা। যান, এখন ঘরে গিয়ে চাচীর সাথে পরামর্শ করুন। বলুন, মেয়েকে বুঝাতে। যেভাবেই হোক বুঝিয়ে কথায় আনতে হবে। তাছাড়া কোন উপায় নাই।

এক সময় চোখের জল ফেলতে ফেলতে চাচা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন।

-৫৫-

নির্মলা মারা গেছেন। ছেলে অশোক এ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার আগেই নাসা থেকে অফার পেয়েছে। তার এক সহপাঠিকে বিয়ে করে বাবা মা'কে খবর পাঠিয়েছে। অনেক গুলো ছবিও পাঠিয়েছে। মেয়েটা আমেরিকান। দু'জনেই নাসাতে চাকরি করছে। নির্মলা এই বিয়েতে খুশি নন। তিনি যা চেয়েছিলেন তা কিছুই হচ্ছে না। তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। কত আশা ছিল ছেলের বিয়েতে নিউইয়র্কের সব

বাঙালীকে নিয়ে বড় আকারে আনন্দ উৎসব করবে, মানুষ দেখবে, জানবে তার সোনার ছেলে নাসাতে চাকরি পেয়েছে, একটা মনের মত বউ বিয়ে করেছে। সে আশা গুড়েবালি। কেউ জানলনা তার ছেলে এতবড় চাকরি পেয়েছে। বাঙালীর গর্ব। যাকে নিয়ে গর্ব সে নাগালের বাইরে থাকলে গর্ব করার সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়। ইচ্ছে করলেও আসতে পারে না। যখন তখন ছুটি পাওয়া যায় না। ছুটি পেলেও তাদের সাথে থাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটির লোক। সরকারের বাড়ীতে থাকে। সেখানে মানুষ যেতে পারে না। এমন কি মাতাপিতাও সেখানে সহজ ভাবে যেতে পারেনা। ছেলে নাকি এখন আমেরিকার বিশিষ্ট নাগরিক। তার দেখাশোনার দায়ীত্ব সরকারের। মিসেস সেন এতবড় চাকরিতেও খুশি নন ছেলেকে হাতের কাছে না পেয়ে। মনে হয় ছেলে যেন হারিয়ে গেল। এই দুঃখটা তিনি ভুলতে পারেন না।

তারপরই পিঙ্কির জবরদস্তির বিয়ে। নিজেই সব ঠিকঠাক করল। মনে হল যেন একটু দাওয়াত পেল মেয়ের বিয়েতে। মা বাবা অরাজি হলে তাদের কিছু যায় আসে না। এখানে মাতাপিতা কত অসহায়!

পিঙ্কি চলে যাবার পর নির্মলা রাতদিন কি যেন ভাবেন। কোন কিছুতেই মন নেই। মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। এখন কাকে নিয়ে থাকবেন? একটা ছেলেমেয়েও কাছে রইলনা! কেন এদেশে আসলাম! সব হারালাম! কেউ নেই, এখন কিছু নেই! সেন বাবু নামে যে লোকটা এতদিন তার সাথে আছে সে কথাও তিনি ভুলে যান। সব ফাঁকা। মাঝে মাঝে পিঙ্কি যখন টেলিফোন করে তখন তিনি আবেগে কথা বলতে পারেন না। পিঙ্কি খুব খুশি। খুব সুখে আছে এই খবরটা দেয়। এই খবরে তার মন ভরে না। সে তার সন্তানকে কাছে পেতে চায়, সর্বদা দেখতে চায়। এই তিন বছরে অশোক মাত্র একবার এসেছিল। তিন দিনের জন্য। তাও অফিসের কি কাজে। সাথে বউ ছিল। বউটা সর্বদা আঠাঁর মত লেগে থাকে অশোকের সাথে। নিরিবিলিতে এক দন্ডও কথা বলতে পারেনি। এতদিন একটা সন্তান কাছে ছিল। সেও চলে গেল! এখন সব ফাঁকা। এক সময় তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এম্বোল্যান্স ডাকা হল। হসপিটালে সব রকম পরিক্ষা করে ডাক্তার বলল, মাইল্ড ষ্ট্রোক হয়েছে। সাবধানে থাকতে হবে। সাতদিন পর হসপিটাল থেকে ফিরে এল।

সাত মাস পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবার হসপিটাল। এবার পুরোপুরি হার্ট এ্যাটাক। কাউকে বেশি কষ্ট না দিয়ে তিনি চলে গেলেন চিরতরে। দেবতার হাত ধরে। সেনবাবুকে একা ফেলে। যেভাবে সকলেই যায়

নির্মলাকে সমাহিত করে সেন বাবু ঘরে ফিরে এলেন। ছেলেমেয়েকে খবর দেয়া হয়েছিল। পিঙ্কি দুদিন পরে আসবে। অশোক আসতে পারেনি। কাজের ভীষন চাপ। তবে বাবাকে শোকবার্তা পৌঁছে দিয়েছে। টেলিফোনে। কয়েকবার ফোন করেছে অশোক। সে তার বাবার মত হয়েছে। সহজে চোখ দিয়ে জল পড়েনা। সবকিছুকেই স্বাভাবিকভাবে নিতে চেষ্টা করে। মৃত্যু প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। নিয়মের বাইরে কিছু আশা করা বোকামি।

বাড়ীতে ঢুকেই সেন বাবু নিজকে খুব একা অনুভব করলেন। ঘরে আর কেউ নেই! এতদিন তো একটা রোগি ছিল। মনে হত কেউ একজন আছে তার সাথে। তিনি এ ঘর ও ঘর করলেন। না, কেউ নেই। কিছু নেই! শুধু আসবাবপত্র, খাট পালং ইত্যাদি। এই বাড়ীর ভেতর তার

জগতটা ছিল লিভিং রুম, নিজের বেড রুম আর দক্ষিনের লম্বাচওড়া বারান্দাটা। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে তিনি বাইরের দৃশ্য দেখে দেখে বেশির ভাগ সময় কাটান। বই পড়েন। স্তব্দ দুপুরে, সকাল সন্ধ্যায় পাখির কলরব কিচিরমিচির খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন। অশোকের ঘরটা অনেক আগে থেকেই দরজা বন্ধ। পিঙ্কির ঘরও এখন খালি। গেষ্টরুম খোলা থাকে। এসব রুমে তিনি কোনদিনই উঁকি দিয়ে দেখেননি। আজ তিনি প্রতিটি ঘরে গেলেন। কি যেন খুঁজে বেড়ালেন। অশোকের ঘরে একটা শো কেস। তাতে অশোকের সমস্ত মেডেল, কোন্ ক্লাশে কিসের জন্য মেডেল পেয়েছিল এসব সাজানো আছে। নীচে লেখা আছে দিন তারিখ। কতগুলো সার্টিফিকেট কাচের ফ্রেমে বাধানো। কোনদিনই তিনি এগুলো এত মনোযোগ দিয়ে দেখেননি। আজ একটা একটা করে দেখলেন। দেখলেন আর ফিরে গেলেন দশ বছর আগে, পনের বছর আগে যখন এরা ছোট ছিল। এই বাড়ীটা প্রথম খরিদ করেছিলেন। বাড়ীর তিন দিকেই খোলা জায়গা, বাগান। অশোক পিঙ্কি খেলা করত। তাদের বন্ধুরা আসত। কলকাকলি আর দুজনের ঝগড়া লেগেই থাকত।

তিনি পিঙ্কির ঘরে গেলেন। তার রুমে ওয়াক-ইন ক্লোজেট। দরজা খুললেন। তার সখের সব কাপড় চোপড় তেমনি আছে। মনে হয় সে স্কুলে গেছে। এখনি আসবে। তার বিছানা বালিশ তেমনি সাজানো আছে। নির্মলা এগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার করে রাখত। সবকিছু ছিমছাম। যেন সকলেই বাড়ীতে আছে। এখনি ফিরে আসবে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে চোখ গেল। তার চুলের কাটা, চিরুনী, হাত ব্যাগ সবই তেমনি আছে। বেরিয়ে আসছেন, দেখেন দরজার বাইরে পিঙ্কির জুতো সেন্ডেল সাজানো। কত রকমের জুতো। পাগলিটার জুতোর প্রতি খুব সখ। যখন যেখানে যা পছন্দ হয়েছে কিনেছে। এত সখের জুতো অতি যত্নে সাজানো আছে। অথচ ব্যবহার করার কেউ নেই।

তিনি নিজের বেড রুমে ঢুকলেন। বিছানার দিকে তাকালেন যেখানে নির্মলা অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে থাকতেন। বিছানা খালি। বালিশ দুটো যেখানে থাকার কথা সেখানেই তেমনি আছে। বিছানার উপর নির্মলার ম্যাক্সিটা পড়ে আছে যেটা ঘরে পড়তেন। এম্বোল্যান্স আসার আগে সেনবাবুই সাহায্য করেছিল বদল করতে। সেটা এখনও বিছানার উপর পড়ে আছে। তিনি হাত দিয়ে উঠিয়ে ক্লোজেটে রাখলেন। ক্লোজেটে তার সমস্ত পোষাক সাজানো আছে। সে শাড়ী পছন্দ করত। শাড়ী রাখার জন্য আলাদা হ্যাঙ্গার কিনেছে। কত শাড়ী! যখন যেটা পছন্দ হয়েছে কিনেছে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল। তার সাজার সব জিনিষ সাজানো আছে। নেইল পালিস কয়েক ডজন, চুলের কত রকম ক্লিপ, একটার পর একটা সাজানো। হাতের ক্রিম, পায়ের ক্রিম, মুখের ক্রিম, কত রকমের ক্রিম। এখানে তার পছন্দমত চিরুনী পাওয়া যায়না। তাই বাংলাদেশ থেকে হাতির দাঁতের চিরুনী এনেছে। ডজন খানেক। সব একটা কৌটায় রাখা আছে। দু পাশে দুটো কাঁচের ফুলের টব। ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে। এক পাশে তার ভ্যানিটি ব্যাগ। তার নিজস্ব সম্পত্তি। যাতে কারও হাত দেবার অধিকার নেই। এমন কি সেন বাবুও কোন দিন হাত দেননি। এই ব্যাগ শুধুই তার নিজের। তিনি অনুভব করলেন নির্মলা আছে কোথায়ও। এখনি হয়ত এসে পড়বে। আর বলবে তুমি আমার ব্যাগে হাত দিয়েছ? তিনি হাত বাড়িয়েও থমকে গেলেন। আজ তার ইচ্ছে এই ব্যাগে কি আছে তিনি দেখবেন। না, কেউ নেই বাধা দেবার, অনুযোগ করার। তিনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে চেন খুললেন।

প্রথমেই বেরিয়ে এল নির্মলার গ্রীন কার্ড। ছবিটা কত পরিষ্কার! আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তোলা ছবি! তখন নির্মলা ছিল ২৯ বছরের। ছবিটা সাদা কালো। এইজন্য খুবই আকর্ষনীয় হয়েছে। তারপর কয়েকবার গ্রীন কার্ড বদল হয়েছে। নতুন ছবি দিয়ে। কিন্তু এই পুরনো কার্ডখানা সে রেখে দিয়েছে। আরও জিনিষ বেরোল। একটা ছোট চিরুনী, মেইকআপ বক্স, ছোট্ট একটা আয়না। তার এক পিঠে মেইকআপ এবং অপর পিঠে আয়না। একটা চিঠি। মনে হল বহু পুরনো। ব্যবহারে একবারে আশঁ উঠে গেছে খামের। খামটা হাতে নিল। নির্মলার নাম। ঠিকানা সেই প্রথম যে বাসায় তারা থাকত সে বাসার। সে আজ কতদিন! সেই বাসার অনেক স্মৃতি তার মনে পড়ল। নির্মলা এখানে এসে একা পড়ে গেল। দেশের জন্য, বাড়ীর জন্য, তার মায়ের জন্য সব সময় মন খারাপ থাকত। তাকে খুশি রাখার জন্য সেন বাবু কত কি করত! চিঠির খামটা খুলল। ভেতরে একটা চিঠি। তার মায়ের লেখা। মা মারা গেছে আজ পনের বছর। সেই চিঠি সে তার ব্যাগে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। চিঠির খামের নীচেই একটা সিঁদুরের কৌটো। হাতে নিল। খুলে দেখল অর্ধেকের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হল নির্মলা এখনি চলে আসবে। আবার মাথায় সিঁদুর দেবে। তার চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু পড়তে লাগল। যে মানুষ কোনদিন মুষড়ে যায়নি, সব কিছুকেই সহজ ভাবে নিয়েছে, কেউ কোন দিন তার চোখে জল দেখেনি, সেই চোখে আজ অশ্রুর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কৌটা হাতে তিনি অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন। না, কেউ আসেনি এই অনধিকার চর্চায় বাধা দিতে। কেউ নেই! তিনি একা।

দুদিন পর পিঙ্কি এসে অনেক কান্নাকাটি করে একদিন থেকে বাবাকে অনেক উপদেশ দিয়ে চলে গেল। তারপর সেন বাবু আবার একা।

এঘর সেঘর করতে করতে তার একটা বছর কেটে গেল। ছেলেমেয়েরা যখন সময় পায় টেলিফোনে বাবার খবর নেয়। সেন বাবুর খাওয়াদাওয়ার প্রতি মন নেই। নিজে রান্না করতে ভাল লাগেনা।তিনি মনে করেন আর তো কেউ নেই। নিজের জন্য টিন ফুডই যথেষ্ট। তাই তিনি টিন ফুডের উপর নির্ভর করেই চলেছেন। বাড়ীর যেদিকেই একটু সময় কাটাবার চেষ্টা করেন অনেক স্মৃতি এসে তাকে কাটার মত বেঁধে। অশোকের স্মৃতি, পিঙ্কির স্মৃতি, নির্মলার স্মৃতি। মাঝে মাঝে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। এত শক্ত মনের মানুষ আজ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি দেখলেন এই বাড়ীর সবকিছুই তাকে ব্যথিত করছে। এতবড় বাড়ীতে তিনি একা থাকার কোন মানে হয়না। তিনি থাকতে পারবেন না! এই বাড়ীতে এত জিনিষ পত্র এসবেরও তার প্রয়োজন নেই।

একদিন সবই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়!

ক্রমশঃ...